Downloaded from: justpaste.it/siratthekeshikkha

সিরাত থেকে শিক্ষা – শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ)

১-১৫ পর্ব

[পর্ব ১]

বদর যুদ্ধঃএক

প্রিয় ভাইয়েরা, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং বর্ষিত হোক আল্লাহপাকের রহমত ও বরকত। আমরা বদর যুদ্ধের ঘটনাবলি জানি এবং ইসলামের প্রথম যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে থাকি। এই বদর যুদ্ধকে আল্লাহ্পাক يوم الفرقان বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সকল মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহপাক এই দিনকে নিপীড়িত-নির্যাতিতদের বিজয়ের জন্যে এবং অহংকারী ও প্রতাপশালীদের ধ্বংস করার জন্যে নির্ধারন করেছিলেন। এই যুদ্ধ ছিলো আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং এর রহস্য ছিলো অনুদ্ঘাটিত। আল্লাহপাক এই যুদ্ধকে মানুষের মাধ্যমে সংঘটিত করেছেন। বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহপাক কুরআনে বলেছেন-

إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

“স্মরণ করো, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে আর তারা ছিলো দূর প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে১। যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাইতে তবে এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হতো। কিন্তু যা ঘটার ছিলো আল্লাহপাক তা সম্পন্ন করলেন২— যাতে যে ধ্বংস হবে সে যেনো সত্যাসত্য প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেনো সত্যাসত্য প্রকাশের পর জীবিত থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’। [সুরা আন্ফালঃ আয়াত ৪২]

আমাদের রবই যুদ্ধের বিষয়গুলো সাজিয়ে দেন। তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাবলি পরিচালনা করেন। আল্লাহপাক তাঁর সৈন্যদেরকে সাহায্য করেন। তাঁদের সঙ্গে থাকে পাথর, সঙ্গে থাকে বৃষ্টি, সঙ্গে থাকে তীর, সপ্ন ও তন্দ্রা। আল্লাহপাক এগুলোকে তাঁদের বিজয়ের উপকরণ বানান।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

‘স্মরণ করো, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্যে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন- তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্যে, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্যে, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্যে এবং তোমাদের পা অটল রাখার জন্যে’। [সুরা আন্‌ফালঃ আয়াত১১]

[বদর রণাঙ্গনে কিছু সময়ের জন্যে মুসলিম বাহিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। এতে তাঁদের ক্লান্তি ও ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়। যুদ্ধের শুরুতে বৃষ্টি হয়, ফলে বালুময় মাটি স্থির হয় এবং মুসলমানদের ময়দানে চলাফেরা অসুবিধা ও পানির কষ্ট দূর হয়।]

তন্দ্রা তাহলে স্বস্তি। নামাযের মধ্যে তন্দ্রা নিন্দনীয়, কিন্তু যুদ্ধের সময় তন্দ্রা প্রশংসিত। বোমাবর্ষণ, গোলানিক্ষেপ, কামানের গর্জন আর বোমারু বিমানের চিৎকারে মানুষ কিভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে পারে! এই ধরনের ঘটনা আফগানিস্তানে অনেকবার ঘটেছে। মৌলবি আরসালান এবং আরো অনেকেই যুদ্ধের ময়দানে তাঁদের ঘুমিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার পর প্রতিটি সৈনিক নতুন সাহসে নতুন উদ্দীপনায় জেগে উঠে। ভাই ওসামা বিন লাদেন জাজিও যুদ্ধের ময়দানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর হাতে ওয়াকিটকি ছিলো। ঘুমিয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর হাত থেকে ওয়াকিটকি পড়ে যায়। সে মুহূর্তে পুরো দমে যুদ্ধ চলছিলো। গোলাবর্ষণ চলছিলো এবং শত্রু কমান্ডোরা দুইশো কি তিনশো মিটার দূরে ছিলো। সেই মুহূর্তে ওসামা বিন লাদেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং বৃষ্টি পড়ছিলো। আল্লাহপাক কুরআনে কতো সত্যই না বলেছেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন পবিত্র করার জন্যে...। এবং এতে আত্মাও প্রশান্তি ফিরে পায়। কেননা বদর যুদ্ধে কতিপয় সাহাবির ওজুর বদলে ফরয গোসলের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু তাঁদের নিকট পানি ছিলো না। তাই আল্লাহপাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারন করেন। এই কুমন্ত্রণা মানুষের ভেতরের কুমন্ত্রণা যা মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। এবং এই বৃষ্টির পানির মাধ্যমে তিনি তাঁদের পা অটল রাখেন। কেননা দেহ ও মন যখন সব দিক দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকে, তখন মানুষের আত্মার শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। তাঁর সংকল্প সুদৃঢ় হয়ে ওঠে এবং তিনি তা বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যান। আপনি কি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন নি যখন আপনি নামায পরেন এবং পবিত্র অবস্থায় থাকেন অথবা রাত জেগে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করেন তখন আপনার আত্মার শক্তি অনেকগুণে বেড়ে যায়? সাধারণ অবস্থায় এই শক্তি আপনার ভেতর থাকে না এবং আপনি এতে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মত ধৈর্য অর্জন করেন না।

বদর যুদ্ধে ফেরেশতারাও মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

‘স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং তোমরা মুমিনদেরকে অবিচল রাখো। যারা কুফরি করে আমি তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দেবো; সুতরাং তোমরা আঘাত করো তাদের কাঁধে এবং আঘাত করো তাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে’। [সুরা আনফালঃ আয়াত ১২]

আল্লাহপাক বললেন যে, তিনি নিজেই তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেন। ভয় আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে এক ধরনের আক্রমন, এক ধরনের গোলা। এই গোলা কাফেরদের অন্তরে আঘাত করে এবং তাদের অভ্যন্তরকে তছনছ করে দেয়। তাদের চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, মগজকে এলোমেলো করে দেয় এবং তা তাদের পরাজয়ের এবং পালিয়ে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহপাক বলেছেন, আমি তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দেবো তাহলে তোমরা কী করবে? তোমাদের কাজ হচ্ছে তাদের কাঁধে এবং তাদের আঙ্গুলের ডগায় আঘাত করা। এই আঙ্গুলগুলো, যেগুলো তরবারি ধরে রাখে, তোমরা তাদের সে-আঙ্গুলগুলো কেটে দাও। তোমরা আর কী করবে? হ্যাঁ, যুদ্ধের ময়দানে আরো করণীয় রয়েছে।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। আর এটা মুমিনদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করার জন্যে’। [সুরা আনফালঃ আয়াত ১৭]

তাহলে কেনো আল্লাহপাক এগুলো করেন? কেনো তিনি যুদ্ধের ঘটনাগুলো মানুষের হাত দিয়ে সংঘটিত করেন? কারণ তিনি মুমিনদেরকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করতে চান। যাতে কেউ না বলে আমি লড়াই করেছি। যাতে কেউ না বলে আমিই বিজয়ী হয়েছি।আমি এই আমি সেই। বরং এই ঘটনাগুলো মহাপরাক্রমশালী সত্তা মানুষের মাধ্যমে ঘটিয়ে থাকেন। মানুষ এখানে মাধ্যমমাত্র; তার মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত বিষয় বাস্তবায়িত হয়। তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে

হত্যা করেছেন। এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ চলাকালে একমুঠো কঙ্কর নিলেন। তিনি কঙ্করগুলো শত্রুদের চেহারায় ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন شاهت الوجوه, شاهت الوجوه বা চেহারা ধূলিধূসরিত হোক, চেহারা ধূলিধূসরিত হোক। ফলে কী ঘটলো? প্রতিটি মুশরিকের চোখে কঙ্কর ও ধুলোবালি প্রবেশ করলো। কিভাবে ঘটলো! একমুঠো কঙ্কর এক হাজার মুশরিকের চোখে কীভাবে প্রবেশ করলো! আর আফগান যুদ্ধে জালাল উদ্দিন হক্কানির জামাতা খিয়াল মুহাম্মদের একমুঠো কঙ্কর কীভাবে আশিটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করলো! আল্লাহপাক কতই না সত্য বলেছেন, তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।

শত্রু বাহিনী আশিটি ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে খিয়াল মুহাম্মদের দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তাঁদের দলে ছিলো মাত্র চল্লিশ জন মুজাহিদ। তাঁদেরকে জীবিত ধরার জন্য ট্যাঙ্কগুলো এগিয়ে আসছিলো। খিয়াল মুহাম্মদ বলেন, 'আমরা যোহরের নামায আদায় করলাম। অনেক কান্নাকাটি করলাম। আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করে বললাম, তিনি আমাদের বিরুদ্ধে কাফেরদের যেন বিজয়ী না করেন। আমাদের দিকে তাদের পথকে যেন সুগম না করেন। আমাদেরকে ধরা তাদের পক্ষে যেন সম্ভব না হয়'। মুহাম্মদ বলেন, 'তারপর আমি একমুঠো কঙ্কর নিলাম এবং কঙ্করগুলো ধাবমান ট্যাঙ্কগুলোর দিকে ছুঁড়ে মারলাম'। তিনি একমুঠো কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। একমুঠো কঙ্কর কী করবে আশিটি ট্যাঙ্কের? সেগুলোকে বিকল করে দেবে? কী করবে মাত্র একমুঠো কঙ্কর? তিনি বলেন, 'ট্যাঙ্কগুলো যে রাস্তা দিয়ে আসছিলো সেটি ছিলো সরু ও এবড়ো-থেবড়ো। প্রথম ট্যাঙ্কটি এগিয়ে আসছিলো এবং হঠাৎ তা উল্টে গেলো। আমরা বুঝতেই পারি নি কীভাবে তা উল্টে গেলো। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটির উপর আমরা কাঁচ নিক্ষেপ করলাম। ট্যাঙ্কের চালক ভাবলো ট্যাঙ্কের নিচে মাইন পড়েছে। তাই সে তার ট্যাঙ্ক মাঝপথ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু মাঝপথ থেকে সরে গিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো না। ফলে ট্যাঙ্কটি রাস্তার পাশে কাত হয়ে পড়লো এবং চলাচলে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। অন্যান্য ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধযানের জন্য পথ বন্ধ হয়ে গেলো। তখন কী ঘটলো? একটি ট্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য ট্যাঙ্কের সবাই বেরিয়ে এলো, সাদা পতাকা বের করলো এবং আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত উঁচু করলো। কীভাবে এটা ঘটলো? মুজাহিদদের নিকট তো ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কোনো কামান ছিলো না, অস্ত্র ছিলো না এবং কিছু ছিলো না। শুধু একমুঠো কঙ্কর। বিশাল অভিযানের বিরুদ্ধে মাত্র একমুঠো কঙ্কর।

ভাবতে কী আশ্চর্য লাগে! কিন্তু সত্য তো এই-ই। আল্লাহপাক তো অসত্য বলেন না এবং অনর্থক প্রতিশ্রুতি দেন না। খিয়াল মুহাম্মদ বলেন, 'আফগানিস্তানে মুজাহিদদের কাছে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী

কোনো কামান ছিলো না, গোলা ছিলো না। তখন আমরা একটি ট্যাঙ্কে পঁয়ত্রিশটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গোলা ও এক হাজারটি বোমা পেলাম'।

এটা কী করে হলো? মানুষ আসলে কী করতে পারে? মানুষ কেবল মাধ্যম; সে মাধ্যমে তাঁর পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেন। আর আল্লাহপাক মানুষকে এভাবেই সম্মানিত করেন। বলা হয় এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, অমুক আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করেছেন, আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করেছেন। অমুক আফগানিস্তানে জিহাদ করেছেন এবং অমুক আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করেছেন। অমুক বিশটা কমিউনিস্টকে হত্যা করেছেন, তাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তারাই কি কমিউনিস্টদের হত্যা করেছেন? না, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহপাক তাদেরকে হত্যা করেছেন। আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ বছর পূর্বে আল্লাহপাক এই সিদ্ধান্ত লিখে রেখেছিলেন। তিনি লিখে রেখেছিলেন যে, কমিউনিস্ট রহমত গুল আবু শাবাবের হাতে নিহত হবে। হ্যাঁ, এমনই লিখিত ছিলো। আপনারা কেবল মাধ্যম এবং সেসব সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নকারী। আল্লাহপাক আপনাদের মাধ্যমেই তাঁর সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপ দেন এবং আপনাদের সম্মানিত করেন। যেহেতু আপনারা ইসলামের পতাকা ধারণ করেন এবং দীনকে সমুন্নত রাখেন। বলা হয়, অমুক বিজয়ী হয়েছেন। আসলে আল্লাহপাকই তাঁকে বিজয়ী করেছেন এবং শত্রুদের ধ্বংস করেছেন

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

'বিজয় কেবল মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে'। [সুরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১২৬]

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ

'আল্লাহপাক তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া আর কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে?' [সুরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১৬০]

এবং যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যসংখ্যা কমবেশি হওয়া মনে হওয়াও আল্লাহপাকের কুদরত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের দৃষ্টিতে কাফেরদের সংখ্যা কম মনে হয়েছে এবং কাফেরদের চোখে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি মনে হয়েছে। আবার উভয় দলই উভয় দলকে কম সংখ্যক দেখেছে। কেনো এমনটি হয়েছে? যাতে আল্লাহপাক তাঁর অঙ্গীকার বাস্তব করতে পারেন।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

‘স্মরণ করুন, আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে তারা সংখ্যায় অল্প। যদি আপনাকে দেখাতেন যে তারা সংখ্যায় অধিক তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ-বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত’। [সুরা আনফালঃ আয়াত ৪৩]

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

‘স্মরণ করো, যুখন তোমরা পরস্পরে সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন, যা ঘটার ছিলো তা সম্পন্ন করার জন্যে। সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়’। [সুরা আনফালঃ আয়াত ৪৪]

ঘটনাবলি কার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়? হ্যাঁ, আল্লাহর দিকে। চূড়ান্তরূপে কে সব ঘটান? আল্লাহ। অমুক বিচারক, অমুক শায়খ, অমুক আমির, অমুক নেতা- কী করেন তাঁরা? তাঁরা কি আল্লাহপাকের সিদ্ধান্তকে রহিত করতে পারেন? আল্লাহপাক যদি লিখে রাখেন, আপনি তাঁদের কাছে কোন উচ্চ মর্যাদার পদ পাবেন তাহলে তাঁরা না চাইলেও আপনি আপনার পদ পাবেন। তাঁরা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁধা দিয়েও কোনো কিছু করতে পারবেন না। আল্লাহপাক সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, আপনি মর্যাদাশীল পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং আপনার পদে বহাল থাকবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে আপনার অজান্তেই সব ব্যবস্থাপনা পাল্টে যাবে। আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না কীভাবে কী হচ্ছে। হ্যাঁ, সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। আপনার হাতেও কোনো কিছু নেই, আমার হাতেও কোনো কিছু নেই।

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

‘তোমাদের খেয়াল-খুশি ও কিতাবিদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কোনো কাজ হবে না। কেউ মন্দ করলে তার প্রতিফল সে পাবে এবং আল্লাহ ছাড়া সে নিজের জন্যে কোনো অভিভাবক বা সহায় পাবে না’। [সুরা নিসাঃ আয়াত ১২৩]

সবকিছুর রাজত্ব আল্লাহর হাতে এবং সকল বিষয় তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। সে কারণেই আফগানিস্তানের এইসব ঘটনা- যা আপনি শুনছেন- বাস্তব ও সত্য। সেখানে যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।।

টীকা- সীরাত থেকে শিক্ষা।

১) বদর উপত্যকার যে-প্রান্তটি মদিনার নিকটবর্তী তা নিকট প্রান্ত। আর বিপরীত দিক, যে- দিকে কাফের দল ছিলো তা দূর প্রান্ত। অন্যদিকে নিম্নভূমি দিয়ে অর্থাৎ লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী পথ দিয়ে মক্কার বিধর্মীদের বাণিজ্যিক কাফেলা চলে যাচ্ছিলো।

২) অর্থাৎ উভয় দলকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমবেত করলেন।

৩) পাকিস্তান আফগান সীমান্তবর্তী এলাকা। এখানে ১৯৮৭ সালের ২০শে মে থেকে ১৩ই জুন পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। এ-যুদ্ধে মুজাহিদদের পক্ষে নেতা ও কমান্ডার ছিলেন জালালুদ্দিন হক্কানি, মুহাম্মদ আনোয়ার ও আবদুল্লাহ আয্যাম এবং সোভিয়েত বাহিনীর পক্ষে নেতা ও কমান্ডার ছিলেন বরিস গ্রোমভ, গর্ভাচেভ, নাজিবুল্লাহ ও মুহাম্মদ রফি। এখানে বহু রুশ সেনা হতাহত হয়। এই যুদ্ধ জাজির যুদ্ধ নামে পরিচিত।

[পর্ব ২]

জিহাদের কারামত

আফগানিস্তানে জিহাদের ময়দানে এভাবেই কারামত প্রকাশ পেয়েছে। আপনি যদি সেই জিহাদের ময়দানে গিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় কিছু না কিছু দেখেছেন। মৌলবি আরসালান আমাকে বলেছেন, 'আমাদের সঙ্গে একজন ছিলো তার নাম ছিলো বাতুর। আমি তাকে গোলা নিক্ষেপ করতেই দেখতাম। কিন্তু তখন আমাদের কাছে ছয়টির বেশি গোলা ছিলো না। হঠাৎ শত্রু বাহিনীর ট্যাঙ্ক আমাদের উপর আক্রমণ করে বসলো, আমরা প্রথম গোলাটি নিক্ষেপ করলাম এবং বাতাসে বিস্ফোরিত হলো। এভাবে তৃতীয়টি... চতুর্থটি এবং পঞ্চমটি। আল্লাহপাক আমাদেরকে প্রতিদান দিয়েছেন; আমাদের পাঁচটি গোলাই বিফলে গেলো'।

আসলে আমাদের সঙ্গে যারা ছিলো তাদের অধিকাংশেরই যুদ্ধের ভালো প্রশিক্ষণ ছিলো না। তারা কেউ সামরিক কলেজ থেকে আসে নি। মসজিদের ইমাম ক্যাপ্টেন হয়েছেন, জেনারেল হয়েছেন। হ্যাঁ, আহমদ শাহ মাসউদ৪ কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলবিদ্যার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এখন তিনি রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছেন। 'ইঞ্জিনিয়ার' বশির প্রকৌশলবিদ্যার প্রথম বর্ষ

শেষ করে রুশদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হেকমতিয়ার কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলবিদ্যা বিভাগে মাত্র দেড় বছর ছিলেন। তারপর তিনি রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাঁদের কেউ কি সামরিক কলেজ থেকে বেরিয়েছেন? না, তাঁরা কেউ সামরিক কলেজ থেকে পাশ করেন নি। শায়খ জালাল উদ্দিন কোন সামরিক কলেজ থেকে পাশ করেছেন? তিনি তো মসজিদ থেকে এসেছেন। তিনি কোনো এক মসজিদের ইমাম ছিলেন। এঁরা সবাই দীনি মাদরাসার শিক্ষক বা ছাত্র ছিলেন। আল্লাহপাক তাঁদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাঁরা রুশ বাহিনীর মোকাবেলা করবে। তাই তাঁরা এখন জেনারেল হয়ে গেছেন। এখন তাঁদের কাউকে কাউকে রুশ সেনাবাহিনী জেনারেল বলে সম্বোধন করে। জেনারেল অমুক, জেনারেল তমুক।

আরসালান বলেন, 'আমাদের পাঁচটি গোলাই বাতাসে বিস্ফোরিত হলো এবং বিফলে গেলো। একটিমাত্র গোলা আমাদের হাতে রইলো এবং আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমি বাতুরকে বললাম, তুমি এই গোলাটি নিক্ষেপ করবে না, এটি রেখে দাও। আমরা দুই রাকাত 'সালাতুল হাজত' পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করব। তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর করো। তারপর আমরা দুই রাকাত নামায আদায় করলাম এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। বাতুর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, বহরের কোন গাড়িটির ওপর এই গোলা নিক্ষেপ করবো। আমি তাকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, তুমি ওই বেসামরিক গাড়িটির ওপর গোলাটি নিক্ষেপ করো। সে বললো, কেনো? আমি বললাম, আমরা ঐ বেসামরিক গাড়িটি জ্বালিয়ে দেব। গাড়ির মালিক গাড়িটিকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয় এতে রহস্য রয়েছে। বাতুর গোলাটি নিক্ষেপ করলো এবং তা ঐ বেসামরিক গাড়িটির ওপর গিয়ে পড়লো। আসলে ঐ বেসামরিক গাড়িটির সঙ্গে একটি লরি ছিলো এবং তাতে বোঝাই করা ছিলো গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক। গোলা নিক্ষেপের ফলে গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক দ্রব্য একসঙ্গে জ্বলে উঠলো এবং ভয়াবহভাবে বিস্ফোরিত হলো। লরির গোলাবারুদ ছিটকে গিয়ে অন্যান্য জায়গায় পড়তে লাগলো'। আপনি ভাবুন তো এতে কতটি ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রবাহী যান ধ্বংস হয়েছে? আরসালান আমাকে বলেছেন এবং তিনি সত্যই বলেছেন, 'একটি গোলার আঘাতে আশিটি ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রবাহী যান ধ্বংস হয়েছে'। এটা তো মানুষের কাজ নয়।

এক মুহূর্তে শত্রু দলটির সব শক্তি ধ্বংস হয়ে গেলো। আরসালান আমাকে বলেন, 'ট্যাঙ্কগুলো আমাদেরকে জীবিত ধরার জন্যে এগিয়ে আসছিলো। তখন আমরা আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করলাম, কান্নাকাটি করলাম। আমরা দোয়া করলাম, তিনি যেনো আমাদের ওপর শত্রুদের চাপিয়ে না দেন এবং তারা যেনো আমাদেরকে জীবিত ধরতে না পারে'। আরসালান বলেন, 'আফগান যুদ্ধের ময়দানে আমরা শত্রু বাহিনীর ট্যাঙ্কের ওপর গোলা বিস্ফোরিত হতে দেখতাম।

কিন্তু সেগুলো কোন ধরনের গোলা ছিলো তা আমরা জানতাম না। আমরা ছাড়া সেখানে আর কোনো মানুষও ছিলো না। কারা এইসব গলা নিক্ষেপ করতো তাও আমরা জানতাম না। জিহাদের শুরুর দিকে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। আমরা ছাড়া ময়দানে আর কেউ নেই, অথচ শত্রু বাহিনীর ট্যাঙ্কের ওপর গোলা বর্ষিত হচ্ছে'।

আল্লাহপাকই শত্রুদের ট্যাঙ্কগুলো ধ্বংস করেছেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেছেন। মুজাহিদদের কাছে একটিও ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান নেই, অথচ তাঁরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। কীভাবে এটা সম্ভব হলো? হ্যাঁ আল্লাহ তো সত্যই বলেছেন, 'তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি, আল্লাহপাকই নিক্ষেপ করেছিলেন'। কখনো কখনো একটিমাত্র গুলি ট্যাঙ্কের দেয়াল ভেদ করে ট্যাঙ্কের ভেতর চালককে আঘাত করেছে এবং চালক নিহত হয়েছে। ফলে ট্যাঙ্কটি মুজাহিদদের হস্তগত হয়েছে। একটি গুলি কীভাবে ট্যাঙ্কের দেয়াল ভেদ করলো? কী আজিব! হায় আল্লাহ, কীভাবে এটা সম্ভব! গুল মুহাম্মদ একবার রাতের বেলা মুজাহিদদের ঘাঁটিতে ফিরছিলেন। রাতের অন্ধকারে তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন। হঠাৎ তিনি এক জায়গায় আলো দেখতে পেলেন এবং সেখানে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। আসলে সেটা ছিলো কমিউনিস্ট রুশ সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। রুশ সেনা কমান্ডার তাঁকে ধরে ফেললো এবং বললো, আমরা তোমাকে হত্যা করবো। গুল মুহাম্মদ বললেন, করো হত্যা! রুশ কমান্ডার বললো, তার আগে আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। গুল মুহাম্মদ বললেন, সমস্যা নেই, প্রশ্ন করো। রুশ কমান্ডার বললো, কীভাবে তোমাদের ছোটো একটি গুলি আমাদের ট্যাঙ্ক ভেদ করে? গুল মুহাম্মদ বললেন, শুধু একটি গুলিই নয়, আমরা যদি তোমাদের ট্যাঙ্কের উপর একটি পাথরও নিক্ষেপ করি তবুও তা তোমাদের ট্যাঙ্ক ভেদ করবে। রুশ কমান্ডার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় নি। সে বললো, ঠিক আছে। এখানে ট্যাঙ্ক আছে, দেখি তুমি কী করতে পারো। সে সৈনিকদের একতি ট্যাঙ্ক নিয়ে আসার জন্যে নির্দেশ দিলো। সৈনিকরা ট্যাঙ্ক বাইরে নিয়ে এলো। রুশ কমান্ডার গুল মুহাম্মদকে বললো, এবার যাও, পাথর নিক্ষেপ করো, আমরা দেখি কীভাবে তোমার পাথর ট্যাঙ্ক ভেদ করে। গুল মুহাম্মদ বললেন, আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দাও। রুশ কমান্ডার বললো, ঠিক আছে, নামায পড়ে নাও। গুল মুহাম্মদ দুই রাকাত নামায পড়লেন এবং অনেক্ষণ সেজদায় পড়ে থাকলেন। তিনি দোয়ায় বললেন, হে রব, হে আল্লাহ, তুমি জানো আমাদের গুলি ট্যাঙ্ক ভেদ করতে পারে না, আমাদের মাটির ঢিল বা পাথরও ট্যাঙ্ক ভেদ করতে পারে না। আমরা তোমার শত্রুদেরকে ভয় দেখানোর জন্যেই একথা বলেছি। হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে লজ্জা দিয়ো না, আমাদেরকে হেয় করো না। হে আল্লাহ, তুমি মুজাহিদদের হেয় করো না। তিনি আরো অনেক কিছু বললেন, কাকুতি-মিনতি করলেন এবং দোয়া করলেন এবং দোয়া দীর্ঘ করলেন। তারপর সালাম

ফেরালেন। একমুঠো কঙ্কর ও মাটি নিলেন। তিনবার বিসমিল্লাহ পড়লেন এবং হাতের কঙ্কর ও মাটি ট্যাঙ্কের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্কে আগুন ধরে গেলো। হ্যাঁ, সত্যসত্যই ট্যাঙ্কে আগুন ধরে গেলো। রুশ কমান্ডার বললো, ঠিক আছে তুমি এখন নিরাপদে চলে যাও, তা না হলে ট্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদেরকেও জ্বালিয়ে দিতে পারো। সম্মানের সঙ্গেই তারা গুল মুহাম্মদকে ছেড়ে দিলো। আমি জানি না তারা তাঁকে কালাশনিকভ দিয়েছিলো কি-না এবং অভিবাদন জানিয়েছিলো কি-না। তারা তাঁকে বললো তুমি নিরাপদে চলে যাও। আমরা যেভাবে আছি সেভাবেই থাকবো। আমরা শিরকের সঙ্গেই থাকবো। শিরকি আমাদের জন্য যথেষ্ঠ। আল্লাহ তো সত্যই বলেছেন, 'তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করেছেন'।

আমরা ভাইয়েরা, আসলে আফগানিস্তানে যা ঘঠেছে, মানবমস্তিক তা কবুল করবে না। আসলে আফগান যোদ্ধাদেরকে কেউ সহায়তা করে নি। আরবরা তাদেরকে চার বছর পর চিনেছে। ১৯৮২ বা ১৯৮৩ সালের পর আরবরা তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছে। আরবরা তাদেরকে কী দিয়েছে? কী দিয়েছে আরবরা তাদেরকে? আমার মনে হয়, ১৯৮৩ সালের দিকে তাদেরকে দশ মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছিলো। কী মূল্য আছে দশ মিলিয়ন ডলারের? যেখানে রুশ বাহিনী প্রতিদিন খরচ করেছে ৪৩ মিলিয়ন ডলার। আর মুজাহিদরা পাঁচ বছরে পেয়েছেন মাত্র দশ মিলিয়ন ডলার। এটা কেমন ব্যাপার? আপনি যদি রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের বিজয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর কুদরত ও তাঁর বড়ো বড়ো কারামত- যা এই শতাব্দীতে আফগানিস্তানে ঘটেছে- বুঝতে চান, তাহলে আপনাকে আফগান যুদ্ধকে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করতে হবে। ইরাক-ইরান যুদ্ধে আরবের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। তারা যখন যুদ্ধে যোগ দেয় তখন তাদের কাছে ছিলো প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলার। আরবরা তাদেরকে প্রদান করে প্রায় ৫৪ বিলিয়ন ডলার। আর এখন তাদের ওপর ঋণ রয়েছে ৫৩ বিলিয়ন ডলার। টাকার এই অঙ্ক কি আপনার বিশ্বাস হয়? গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এখন পর্যন্ত ইরাক-ইরান যুদ্ধে যে কাল্পনিক অঙ্কের টাকা খরচ হয়েছে তা এক লাখ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। কী তারা করেছে? ব্যার্থতা ছাড়া তো তাদের কিছু অর্জিত হয় নি। কুয়েতের জন্যে অবশ্য দুটি আনন্দের বিষয় আছে। ইরাকের বিজয়ও তো ব্যার্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কী তারা করেছে?

নয় বছর যুদ্ধ করার পরও কেউ নয় কিলোমিটারও এগিয়ে যেতে পারে নি। এরাও পারে নি, ওরাও পারে নি। পশ্চিমাদের এমন কোনো অস্ত্র নেউ যা তারা তাদের ভূমিতে ব্যবহার করে নি। কেনো তারা এটা করেছে? ইরাক-ইরানের যুদ্ধ গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিকে নাড়া দিয়েছে। আর এই আফগান মুজাহিদরা আল্লাহর মিসকিন। তাঁদের তো কিছুই নেই। তাদেরকে একটা মিসাইল বা একটা ক্ষেপনাস্ত্র দিলে সারা দুনিয়ার কী ক্ষতি হয়ে যায়? একটিমাত্র মিসাইল, একটি মাত্র

ক্ষেপণাস্ত্র দিলে কী ক্ষতি হয় তাদের? এতে কি দুনিয়ার অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায়? একটা ক্ষেপণাস্ত্রের দাম কতো? ৭০ হাজার ডলার।

আল্লাহর মুজিযা বা বড়ো কারামত- যেগুলো আফগানিস্তানে সংঘটিত হয়েছে-মানুষের জ্ঞানের পক্ষে তা কবুল করা সম্ভব নয়। রাশিয়া পরাজিত হয়ে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে না যেতো, গোটা দুনিয়া যদি রাশিয়ার লাঞ্ছনা, বিপর্যয়, পরাজয় আর ব্যর্থ হয়ে হয়ে পালিয়ে যাওয়া না দেখতো তাহলে তারা এইসব মুজিযা আর কারামত বিশ্বাস করতো না। আল্লাহই নির্ধারিত বিষয় বাস্তবায়িত করেন। যার সঙ্গে আল্লাহ নেই সেই বড়ো মিসকিন। আল্লাহর কসম, আল্লাহপাক কতো সত্যই না বলেছেন-

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ

‘আল্লাহপাক তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া আর কে এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে?’ [সুরা আলে ইমরানঃ আয়াত ৬০]

আল্লাহপাক তাঁদেরকে সাহায্য করলে কে তাঁদেরকে পরাজিত করবে? আমেরিকা, রাশিয়া না-কি অন্যকেউ? আর আল্লাহপাক সাহায্য না করলে কারো সাহায্য কাজে আসবে না। কিন্তু মুমিনরা তো আল্লাহর ওপরই ভরসা করেন। আল্লাহই তাঁদের সহায়। সুতরাং মীমাংসা আল্লাহরই হাতে, শুরুতেও এবং শেষেও।

বদরের যুদ্ধই এই সাক্ষ্য বহন করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে এক দূতকে দেখতে পেলেন। দূত তাঁকে বললেন, আপনারা যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ুন। আল্লাহপাক আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দুইটি কল্যাণের একটি কল্যাণ অথবা দুইটি দলের একটি দল আপনাদের আয়ত্তাধীন হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতে পেলেন আবু সুফিয়ানের কাফেলা শাম থেকে ফিরে আসছে। তারা মদিনার নিকট এলাকা দিয়ে মক্কায় যাবে। এই কাফেলায় রয়েছে ত্রিশ জন বা চল্লিশ জন লোক এবং তাদের সঙ্গে রয়েছে কিশমিশ ও অন্যান্য সামগ্রী বোঝাই এক হাজারটি উট। এই কাফেলায় মক্কার সমস্ত কুরাইশ অংশীদার। এমন কোনো কুরাইশ নারী-পুরুষ ছিলো না যার অংশ এই কাফেলায় ছিলো না। তারা কাফেরদের সরদার আবু সুফ্য়ানের নের্তৃত্বে এগিয়ে আসছে। কুরাইশদের এই বাণিজ্য আর বাণিজ্যিক পুঁজিই ছিলো তাদের মূল শক্তি। এই শক্তির কারনেই তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিদের উৎপীড়ন করে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছিলো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন, ‘তোমরা বের হও, আল্লাহপাক তো এইসব মাল হস্তগত করে দেবেন’। কোনো কোনো সাহাবি বললেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমাদের সোয়ারি তো মদিনার বাইরে গ্রাম এলাকায়। আমরা কীভাবে তাদের মোকাবেলায় বের হবো?’ কিন্তু সে-সময় মদিনার বাইরে থেকে সওয়ারি এনে আবু সুফ্য়ানের কাফেলার মোকাবেলায় বের হওয়ার সময় ছিলো না। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘যাদের সোয়ারি এখানে উপস্থিত আছে তারা আমার সঙ্গে বের হও, আর যাদের সোয়ারি এখানে নেই তারা আমাদের সঙ্গে বের হয়ো না’। যাঁরা সে সময়ে প্রস্তুত হতে পারলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে নিয়ে আবু সুফ্য়ানের বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবেলায় বের হলেন। আবু সুফ্য়ান ‘আইনে যুরকা’ নামক স্থানে পৌঁছলে এক ব্যক্তি তাঁকে এই সংবাদ দিলো যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ-কাফেলার অপেক্ষা করছেন। আবু সুফ্য়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর সামনে গুপ্তচর নিয়োগ করলেন। এদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাসবাস বিন আমর ও অন্য এক ব্যক্তিকে সেই এলাকার গোপন সংবাদ আনার জন্যে পাঠালেন। তাঁরা এক ব্যক্তিকে পেলেন যার নাম ছিলো মাজদি বিন আমর। তারপর আবু সুফ্য়ান যখন মাজদি বিন আমরের পাশ দিয়ে গেলেন, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি এই এলাকায় কোনো লোক দেখেছো?’ মাজদি বিন আমর বললো, ‘না, তবে দুইজনকে তাদের পাত্রে পানি পান করতে দেখেছি’। আবু সুফ্য়ান ছিলেন চতুর ও বুদ্ধিমান।তিনি মাজদিকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা তাদের উটকে কোথায় বসিয়েছিলো? মাজদি বললো, ঐ তো ওখানে। আবু সুফ্য়ান এগিয়ে গেলেন এবং উটের বসার চিহ্ন ও উটের মল দেখতে পেলেন। তিনি সেখানে খেজুরের বিচি পেলেন। এসব দেখে বললেন, ‘আল্লাহর কসম, এটা ইয়াসরিবের খাদ্য। তাহলে এটা সত্য যে মুহাম্মদ আমাদের কাফেলার মোকাবেলা করতে চায়’। তিনি কাফেলার গতিপথ ঘুরিয়ে দিলেন। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এলাকার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং অন্য পথ ধরলেন। ফলে তিনি কাফেলা নিয়ে বেঁচে গেলেন।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, কাফেলা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে তিনি যখন জানতে পারলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসছেন তখন তিনি দমদম বিন আমর নামক এক বেদুইনকে বিশ মিসকাল সোনার বিনিময়ে ভাড়া করলেন। তিনি দমদমকে এই ব্যাপারে রাজি করালেন যে, সে মক্কায় কুরাইশ গোত্রকে গিয়ে বলবে, তোমাদের কাফেলা বিপদে পড়েছে। এই বদমাইশ দমদম করলো কি, ভয়াবহ বিপদের সঙ্কেতসরূপ তার উটের নাক-কান কেটে ফেললো, হাওদাটি উল্টো করে উটের পিঠে বসালো এবং তার পরিধেয় বস্ত্রের সামনে ও পিছনে ছিঁড়ে ফেললো। যখন সে মক্কায় প্রবেশ করলো- গোটা নগরীতে হইচই পড়ে গেলো। সে

উপত্যকায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো, ‘হে কুরাইশ গোত্র, ভয়াবহ বিপদ! ভয়াবহ বিপদ! মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা তোমাদের কাফেলাকে পাকড়াও করতে চায়’।

টীকা- সীরাত থেকে শিক্ষা।

৪) আহমদ শাহ মাসউদ ১৯৫৩ সালের ২রা জানুয়ারি পানশিরের জানকালাক এলাকার বাজারক গ্রামে জন্মগ্রহণ। তাঁর বাবা দোস্ত মুহাম্মদ খান আফগান রয়্যাল আর্মিতে কর্নেল ছিলেন। আহমদ শাহ কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশলবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পশতু ছাড়াও ফরাসি, ফার্সি, উর্দু ভালো বলতে পারতেন এবং ইংরেজি ভালো পড়তে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন জমিয়ত ইসলামির ছাত্র সংগঠন সয্মান-ই জোওয়ানান-ই মুসলমান (Organization of Muslim Youth)- এ যুক্ত হন। তখন জমিয়তে ইসলামির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক বুরহান উদ্দিন রব্বানি। ১৯৭৫ সালের দিকে জমিয়তে ইসলামি ও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হিয্বে ইসলামির মধ্যে বিরোধ শুরু। এ-সময় হিয্বে ইসলামির কর্মীরা আহমদ শাহকে হত্যা করার চেষ্টা করে। ১৯৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব আফগানিস্তান (মার্ক্সবাদী) এবং সেনাবাহিনীর একটি দল প্রেসিডেন্ট দাউদ খানকে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। তারা সমাজতন্ত্রের বিস্তার এবং সেভাবে নীতি নির্ধারণ করতে চাইলে দেশের ইসলামি দলগুলোর সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ-সময় সমাজতন্ত্রী সেনাদের হাতে সারাদেশ পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ মানুষ নিহত হয়। ১৯৭৯ সালে ২৪ টি প্রদেশে সংঘাত শুরু হয়। অর্ধেকের বেশি সৈনিক সেনাবাহিনীর থেকে পালিয়ে যায়। ৬ই জুলাই আহমদ শাহ মাসউদ পানশিরে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সম্মুখ যুদ্ধে সফল না হয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। এ-বছরেই ২৪ শে ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগান সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সেনা প্রেরণ করে। সরকারবিরোধীদের তারা নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। আহমদ শাহ সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং প্রতিরোধ যুদ্ধের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেন। ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রুশ বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করে। তারপরও পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সরকার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। আহমদ শাহ সরকারবিরোধী লড়াই অব্যাহত রাখেন। দেশে চরম দুরাবস্থা বিরাজমান রেখে ১৯৯২ সালে ১৭ই এপ্রিল এ-সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করে। ২৪ শে এপ্রিল পেশোয়ারে সমাজতন্ত্রবিরোধী দলগুলোর মধ্যে শান্তি ও ক্ষমতাবন্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ-চুক্তিতে আহমদ শাহ মাসউদকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও গুলুদ্দিন হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু হেকমতিয়ার এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। পরে অবশ্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর তালেবান ক্ষমতা দখল করে। এ-সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন হিয্বে ইসলামির গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। তালেবান ক্ষমতা দখলের পর প্রেসিডেন্ট হন মোল্লা মুহাম্মদ উমর এবং প্রয়াধানমন্ত্রী হন মোল্লা বুরহান উদ্দিন। আহমদ শাহ মাসউদ তখনো প্রতিরক্ষামন্ত্রী। কিন্তু হেকমতিয়ার ও তালেবান নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ অব্যাহত ছিলো এবং তিনি তালেবান সকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। যদিও তাঁরা উভয়ই তালেবান সরকারবিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটে ছিলেন।

২০০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর (টুইন টাওয়ারে হামলার মাত্র দুই দিন আগে) উত্তর আফগানিস্তানর তাখার প্রদেশে খাজা বাহাউদ্দিন এলাকায় আত্মঘাতি হামলায় আহমদ শাহ মাসউদ নিহত হন। এ হামলার জন্যে আল-কায়েদাকে অভিযুক্ত করা হয়। কারণ ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিলো। এর আগে বহুবার কেজিবি, আইএসআই আফগান কমিউনিস্ট কেএইচএডি, তালেবান ও আল-কায়েদা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে । কিন্তু তাদের সেসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর জন্মস্থান বাজারাকেই তাঁকে দাফন করা হয়।

কমিউনিস্টবিরোধী যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার জন্যে তাঁকে ‘শেরে পানশির’ বা পানশিরের সিংহ নামে ডাকা হয়। তিনিই একমাত্র আফগান নেতা যিনি কখনো আফগানিস্তানের বাইরে থাকেন নি। ২০০১ সালে হামিদ কারজাই সরকার তাঁকে ‘আফগানিস্তানের জাতীয় বীর’ উপাধিতে ভূষিত করে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক। তাঁর স্ত্রী

সাদিকা মাসউদ ২০০৫ সালে ফরাসি ভাষায় রচিত তাঁর ***Pour l'amour de massoud*** *(মাসউদের ভালোবাসার জন্যে) গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এতে তিনি প্রিয়তম স্বামীর ব্যক্তিজীবনের বর্ণনা দেন।*

[পর্ব ৩]

আতিকার স্বপ্ন

আতিকা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। এই ঘটনার কয়েক দিন আগে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, জনৈক ব্যক্তি উটে আরোহণ করে এলেন। তারপর তিনি আবু কুবাইস পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালেন। আবু কুবাইস মক্কার উপকণ্ঠে একটি লম্বা পাহাড়, এটার ওপর এখন মক্কা প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে। আতিকা বলেন, লোকটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে সম্প্রদায়, তোমরা তিন দিনের ভেতর লড়াইয়ের জন্যে বের হও'। আতিকা বলেন, 'তারপর আবু কুবাইস পাহাড় থেকে একটি বড়ো পাথর খসে পড়লো এবং তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। মক্কার কোনো ঘর বাকি থাকলো না যে ঘরে এই পাথরের টুকরো প্রবেশ করলো না'। আতিকা এই স্বপ্নের কথা গোপনে তাঁর ভাই আব্বাস রাঃ –কে বললেন। তিনি তাঁকে সতর্ক করে দিলেন যে, 'তুমি এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না'।

হযরত আব্বাস রাঃ উতবা বিন রবিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন এবং বন্ধু হিসেবে তাঁকে ঘটনাটি জানালেন। উতবা যদিও কাফের ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলেন, কাফেরদের নিকটও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তিনি মক্কার একজন নেতাও ছিলেন। উতবা এই স্বপ্নের ঘটনা অন্যদের জানালেন। শেষ পর্যন্ত এই স্বপ্নের খবর কার নিকট পৌঁছলো? হ্যাঁ, আবু জাহ্লের নিকট। সে হন্তদন্ত হয়ে আব্বাসের নিকট এলো। সে ক্রোধের সঙ্গে বললো, 'শোনো আব্বাস, তোমাদের পুরুষেরা নবুওয়ত দাবি করছে, এটাই কি যথেষ্ঠ নয়? এখন কি তোমাদের নারীরাও নবুওয়ত দাবি করা শুরু করেছে? শোনো, আমরা আতিকার স্বপ্নের শেষ দেখার জন্য তিন দিন অপেক্ষা করবো। যদি সে সত্য বলে থাকে তাহলে যা হবার তাই হবে। আর যদি সে মিথ্যা বলে থাকে তাহলে আমরা লিখে দেবো, তোমাদের পরিবারের চেয়ে মিথ্যাবাদী পরিবার এই আরবে আর একটাও নেই'। আবু জাহেল ছিলো বদমাশ। হে আল্লাহ তুমি তার চোখ

অন্ধ করে দাও। সে ছিলো দাম্ভিকতা আর নিষ্ঠুরতার উৎকৃষ্ঠ উদাহরণ। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে সত্যকে অস্বীকার করেছে।

হযরত আব্বাস রাঃ তাঁর বোন আতিয়ার কাছে এলেন এবং যা ঘটেছে সব বললেন। এ-সময় আব্বাসের অন্য বোনরাও একত্র হলেন। আতিকা বললেন, 'হায় আব্বাস! আবু জাহ্‌ল তোমাদের অপমান করার জন্যে, তোমাদের পুরুষদের অপমান করার জন্যে যা করেছিলো তাই কি যথেষ্ঠ ছিলো না? এখন সে তোমাদের নারীদেরও অপমান করা শুরু করেছে। তারপরও কি তোমরা চুপ করে থাকবে? কী হয়েছে তোমাদের?' এসব কথা শোনার পর আব্বাস রাঃ এর দুঃসাহস জেগে উঠলো। তিনি সোজা কাবায় চলে গেলেন। ঘোষণা করলেন, আবু জাহ্‌লের সঙ্গে এবার বোঝাপড়া হবে। সে যদি আমাকে বাধা দেয় তাহলে অবশ্যই আমি প্রতিশোধ নেবো। তিনি এই অভিপ্রায়ে কাবায় গেলেন যে কয়েকটি যুবক মিলে আবু জাহ্‌লের ঘাড়গোড় ভেঙ্গে দেবে। আবু জাহ্‌ল ছিলো হালকা-পাতলা। কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি ছিলো তীক্ষ্ণ। সে প্রচণ্ড সাহসী ছিলো, শক্তিশালীও ছিলো বটে। সে ছিলো দাম্ভিকতার দৃষ্টান্ত। আল্লাহপাক আমাদের হেফাযত করুন। আব্বাস রাঃ কাবাগৃহে প্রবেশ করলেন। আবু জাহ্‌ল কাবাগৃহেই ছিলো। আব্বাস রাঃ-কে দেখামাত্রই সে কাবাঘর থেকে বের হয়ে পড়লো। সে অন্যদের জিজ্ঞেস করলো, আব্বাসের কী হয়েছে? আব্বাস রাঃ বলেন, 'সে হয়তো আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল যে, আমি তার ক্ষতি করার জন্য এসেছি। সে চিৎকার দিয়ে উঠলো, হে কুরাইশ, তোমরা এলে না, বিপদ! বিপদ!' তার এই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দমদম বিন আমরের চিৎকার শোনা গেলো-'হে কুরাইশ গোত্র, ভয়াবহ বিপদ! ভয়াবহ বিপদ! মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা তোমাদের কাফেলাকে পাকড়াও করতে চায়'।

মক্কার লোকেরা যখন দমদমের অবস্থা দেখলো; তার কাপড়ের সামনে ও পেছনে ছেঁড়া, উটের নাক-কান কাটা, হাওদা উল্টা করে বসানো, তারা চিৎকার দিয়ে উঠলো। তাদের তীব্র জেদ জেগে উটলো। তারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তৈরি হলো। মক্কার এমন কোনো ঘর বাকি ছিলো যে ঘর থেকে কোনো পুরুষ বের হয় নি বা তার স্থলে অন্য কাউকে পাঠায় নি। আবু লাহাব ঘরে বসে থাকতে চাইলো এবং বেশ অর্থকড়ি দিয়ে তার প্রতিনিধি হিসেবে আরেকজনকে পাঠালো। উমাইয়া বিন খাল্‌ফও ঘরে বসে থাকতে চাইলো। সে ছিলো অতিশয় বৃদ্ধ আর অতিশয় মোটা। তাই সে যুদ্ধে বের না হয়ে ঘরে বসে থাকতে চাইলো। এই খবর শুনে তার বন্ধু উকবা বিন আবু মুয়িত একটি ধূপদানি নিয়ে এলো। সে উমাইয়াকে উপহাস করে বললো, 'এই নাও ধূপদানি। মেয়েদের মতো বসে থাকো আর ধূপের গন্ধ শোঁকো।

এভাবেই তারা একজন আরেকজনকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। উকবা বিন আবু মুয়িত তার বন্ধু উমাইয়াকে বদর যুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো; সে আসলে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো জাহান্নামের আগুনে ফেলার জন্যে। এদের ব্যাপারে একটি ঘটনা আছে। উকবা বিন আবু মুয়িত কোনো সফর থেকে এলে নগরীর মান্য ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত করতো। একবার সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও নিমন্ত্রণ করলো। খাবার সামনে উপস্থিত হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না। উকবা কালিমা উচ্চারণ করলো এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন। উকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু উমাইয়া বিন খাল্‌ফ এই ঘটনা শুনে খুব ক্রুদ্ধ হলো। উকবা বললো, 'সে ছিলো সম্মানিত অতিথি। আমি তার মনোরঞ্জনের জন্যে কালিমা উচ্চারণ করেছি'। উমাইয়া বলল, 'তোমার এই অজুহাত আমি মানি না। তুমি এর প্রতিবিধান করো'। এরপর তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে এনে কষ্ট দিলো। আরেক হাদিসে এসেছে, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে আনলো এবং উমাইয়া উকবাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে থুথু নিক্ষেপ করতে বললো। বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে উকবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি মক্কার বাইরে তোমার মাথার উপর তরবারির আঘাত দেখতে পাচ্ছি'। আল্লাহপাক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষদ্বাণীকে সত্য করেছিলেন। বদর যুদ্ধে উকবা ও উমাইয়া নিহত হয়। আলি রাঃ তাদের হত্যা করেন। উমাইয়া বিন খাল্‌ফ ও উকবা বিন আবু মুয়িতের ঘটনায় কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহপাক বলেন-

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

'জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস, আমি যদি রাসুলের সঙ্গে পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! [সুরা ফুরকানঃ আয়াত ২৭-২৮] যাই হোক, উকবা উমাইয়াকে বললো, 'থাকো তুমি নারীদের সঙ্গে। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক। আল্লাহ তোমার চেহারা কুৎসিত করুক'। উমাইয়া বলল, 'তাহলে তোমরা আমার সওয়ারির ব্যবস্থা করো'। তারা এই বুড়ার জন্যে সওয়ারির ব্যবস্থা করলো।

আসলে এইসব বুড়ারা নিজেদের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে গোটা দুনিয়া বিক্রি করে দিতে রাজি। বস্তুত এরা জাতির জন্যে আপদ ছাড়া কিছু নয়। এরা এদের সম্প্রদায়ের বিপদাপদ আর ক্ষতিই

বৃদ্ধি করে। এরা চারপাশের লোকদেরকে মৃত রেখে নিজেরা বেঁচে থাকে। এখনো এই ধরনের গোত্র আপনারা আফগানিস্তানে অনেক পাবেন। এইসব গোত্রের নেতারা মেঘের ওপরে বাস করে আর গোত্রের অন্য লোকেরা বাস করে মাটির নিচে। তারা রুটিও খেতে পায় না। আপনি দেখবেন, রাস্তা করে দিতে চাইলে, বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে চাইলে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে চাইলে এইসব গোত্রপতিরা পাকিস্তান সরকারকে বাধা দেয়। কেনো বাধা দেয়? কারণ তারা মনে করে, সরকার আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়, আমাদের গোত্রের ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়। কেনো বাধা দেয়? কেননা তারা চারপাশে হাশিশের [মাদকদ্রব্য] আস্তানা বানিয়ে রাখতে চায়- যদিও সেখানে প্রতি বছর শত বিলিয়ন রুপি খরচ হয় এবং চারপাশের মানুষ এখন পর্যন্ত একটি রুটিও পায় না। আপনি এইসব গোত্রের ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন হাঁটবেন, কিন্তু এমন একটি জায়গাও খুঁজে পাবেন না যেখান গাড়ি চলতে পারে। কেনো? কারণ, সরকার যদি রাস্তা করে দেয় তাহলে রাস্তা হবে সরকারের। সরকার যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে তাহলে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের কর্তৃত্ব থাকবে সরকারের হাতে। সরকার যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে তাহলে সেটা হবে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তারা ভাবে, তাহলে তো সরকার আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে। অথচ আমরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে চাই। আসলে এরা স্বাধীন জীবনযাপন করতে চায় না; বরং নিজেরা বেঁচে থেকে পুরো গোষ্ঠীকে মৃত বানিয়ে রাখতে চায়। একারণেই গোত্রের লোকেরা থাকে মৃত, জীবিত থাকে শুধু নেতারা। ফলে তারা হাশিশের [মাদকদ্রব্য] ব্যবসা করে এবং হাশিশের বিনিময়ে বেগার খাটে।

আমাদের এক বন্ধু ছিলেন, জারদ-জান্দালে ডাক্তারি করতেন। জারদ-জান্দাল কান্দাহারের সীমান্তে কুয়িতা এলাকায় একটি জায়গার নাম। তিনি বলতেন, জারদ-জান্দাল মানুষের জন্য নিকৃষ্ট এলাকা। জারদ-জান্দাল কেনো এরকম? তিনি বলেন, এই অঞ্চলে হাশিশ [মাদকদ্রব্য] ও আফিমের রাজত্ব। বিশাল এলাকা জুড়ে আফিম চাষ করা হয়। কেউ যদি সাহস করে আফিম-খেতের ভেতর দিয়ে যায় তাহলে সে নির্ঘাত মারা পরবে। জারদ-জান্দাল আফগানিস্তানের ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকা। আফিম ও হাশিশের কেন্দ্রস্থল এটি। সমস্ত এলাকা থেকে আফিম ও হাশিশ এনে এখানে জমা করা হয়। তারপর তা চালান করা হয় ইরানে। ইরান থেকে পাচার করা হয় তুরস্কে। তুরস্ক থেকে পাচার করা হয় ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। ফ্লোরিডাতেও যায় মাদকদ্রব্য। দিনরাত চলে এই পাচার। আমেরিকার ডুবোজাহাজ, মার্কিন যুদ্ধজাহাজ, মার্কিন পুলিশ টহল দিচ্ছে, পিছু ধাওয়া করছে কিন্তু কোনো মাদকদ্রব্য পাচারকারীকে ধরতে পারছে না। আর মাদকদ্রব্যে আসক্তির কারণে জারদ-জান্দালে বহু লোক মারা যাচ্ছে।

তাহলে বোঝাই গেলো এইসব নেতারা কতোটা খতরনাক। অর্থাৎ, আমি বলতে চাচ্ছি যেসব নেতারা আল্লাহকে ভয় করে না তাদের জাতির জন্যে বড়োই ক্ষতিকারক ও বিপদজনক। আপনারা তাকালেই দেখবেন, ইরাক জাতির ওপর সাদ্দাম বিপদের কী বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি ইরাক জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছেন। তিনি চিন্তা করেছেন দু-তিন দিনের ভেতর তেহরান পৌঁছে যাবেন। এভাবেই তাঁর অন্তর তাঁকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং তিনি গোটা আরবের একনায়ক হয়ে বসেছেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষে ইরানে আক্রমণ করেছেন এবং সেখানে ইরাকি সেনা নিয়োজিত রেখেছেন। তারা ইরানের কিছু ভূমি দখল করতে পেরেছে এবং ইরানিদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। ওদিকে খামিনিও একই চরিত্রের। আর ইরানি লোকদের বিশ্বাস হলো তারা এই যুদ্ধে নিহত হলে শহীদ হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। পুনর্জাগরণবাদীরা এটাকে কীভাবে নিয়েছে? খামিনি তাদেরকে বলেছেন, আমরা যুদ্ধের জন্যে এক লাখ চাই, তারা দিয়েছে দুই লাখ।

সাদ্দাম সবাইকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করেছেন। কেউ যদি যুদ্ধ পালিয়ে এসেছে বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃত জানিয়েছে তাকে দশটি বা বিশটি গুলি ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে। পরিবারের লোকজন যখন লাশ নিতে এসেছে, গুলির দাম পরিশোধ করা ব্যতীত লাশ হস্তান্তর করা হয় নি।

গোটা দেশকে তিনি ধ্বংস করেছেন। এক মূর্খের মূর্খতার কারণে গোটা প্রাচ্য ধ্বংস হয়েছে। এই সাদ্দাম ব্যাটা ছিলো ডাকাত। সার্জেন্ট থাকা অবস্থায় সাদ্দাম সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যান। বিচারকার্য সম্পন্ন করার জন্যে আদালতে হাজির হতে সমন জারি করা হয়। তবুও সাদ্দাম পলাতক থাকেন। এভাবে অনেকদিন কেটে যায়। এরপর মিশেল আফলাক তাঁকে ধরে আনেন এবং দেখাশোনা করেন। মিশেল আফলাকের সহায়তায় ব্রিটেনের সংবাদপত্রের সঙ্গে সাদ্দামের যোগাযোগ ঘটে। তাদের মাধ্যমে সাদ্দাম আবার ইরাকে প্রতিষ্ঠিত হন। মিশেল আফলাক তাকে আহ্বান জানায়, সাদ্দাম তুমি কিছু দিনের জন্যে তোমার চাচাতো ভাই আহমদ আল বকরের স্থলাভিষিক্ত হও। তারপর আমরা তাকে অপসারণ করবো এবং তোমাকে রাফেদিনদের নেতা বানাবো। তারপর বানাবো আরবের নেতা। তুমি শুধু অপেক্ষা করো। একারণেই সাদ্দাম যখন মিশেল আফলাক সম্পর্কে আলোচনা করতেন, বলতেন, 'তিনি ছিলেন মহান পথপ্রদর্শক ও মহান নেতা। আমি যখন তাঁর সামনে মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে বসেছি, আমি ছয়মাসের জন্যে ইলহাম [দিকনির্দেশনা] গ্রহণ করেছি'। পাঠক খেয়াল করুন, সাদ্দাম কার থেকে ইলহাম

[দিকনির্দেশনা] গ্রহণ করেছেন? মিশেল আফলাক থেকে। হায়রে ইলহাম! মিশেল আফলাক ছিলেন ইংরেজদের এজেন্ট। একারণেই তিনি যখন ইরাকে দ্বিতীয় বার ফিরে এসেছিলেন, একটি ইরাকি দৈনিক পত্রিকা শিরোনাম করেছিলোঃ 'প্রভুর প্রত্যাবর্তন'। ভাবুন একবার, 'প্রভুর প্রত্যাবর্তন'। শুধু তাই নয়, এক ইরাকি কবি মিশেল আফলাক সম্পর্কে লিখেছেন-

يا سيدي ومعبدي و إلهي

حسبي ألم فتاتكم حسبي

'হে নেতা, হে দেবতা, হে প্রভু, দুঃখ-বেদনা আমার জন্যে যথেষ্ট, তেমনি আমার জন্যে যথেষ্ট তোমাদের তরুণীরা'।

আর শায়খ সাদ্দাম! তিনি ইসলামি সম্মেলনের ব্যবস্থা করতেন এবং লোকেরা সেখানে যেতো। বাগদাদের সেইসব ইসলামি সম্মেলনে লোকেরা পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করতো। একজন একবার বললো, 'আপনি আমাদের দ্বিতীয় উমর। না, না আপনিই উমর'।

যাই হোক। ইরাকি কবি শফিক কামালি সাদ্দামের প্রশংসায় কবিতা রচনা করলেন-

تبارك وجهك القدسي فينا

كوجه الله ينضح بلجلال

'আমাদের মাঝে তোমার পবিত্র অস্তিত্ব কল্যাণময় হোক; আল্লাহর অস্তিত্বের মতো মহিমায় হোক উজ্জ্বল!'

কী ভয়ঙ্কর! আল্লাহর মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সাদ্দামের অস্তিত্ব! যে-জিব থেকে এই কবিতা বেরিয়েছিলো কী ঘটেছিলো তার ভাগ্যে? মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাদ্দাম নিজের হাতে সেই জিব কেটেছিলেন। আপনারা কি জানেন, কেনো কবির জিব তিনি কেটেছিলেন? যখন প্রচণ্ড-রূপে যুদ্ধ শুরু হলো- বিপর্যয় বাড়তেই থাকলো এবং অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পতিত হলো, তখন ইরাকিরা খামিনিকে জানালো, আমরা যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে চাই। খামিনি বললেন, আমরা এক শর্তে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে রাজি আছি, সাদ্দামকে তার ক্ষমতা থেকে সরতে হবে। এই খবর শুনে

কবি শফিক কামালি মন্তব্য করলেন, ‘এই শর্ত অনুযায়ী নেতা সাদ্দাম যদি তার আরশ থেকে নেমে যায়, তাহলে এ-যাত্রায় দেশ বেঁচে যায়’। কামালির এই মন্তব্য সাদ্দামের কানে পৌঁছলো।

সাদ্দাম ছিলেন ডাকাত, কুখ্যাত অপরাধী ও ঘাতক। তিনি শিয়াদের ষোল বছর বা এরকম বয়সী এক তরুণ নেতাকে খুন করেছিলেন। এই খুনের পর এক-দুই ঘণ্টার ভেতরে পুলিশ সাদ্দামকে গ্রেপ্তার করেছিলো এবং বিচারকদের সামনে উপস্থিত করেছিলো। তারপর মনোচিকিৎসককে ডেকে আনা হলো। তারা মনোচিকিৎসককে জিজ্ঞেস করলো, ‘আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলুন একি খুনি না-কি খুনি নয়?’ মনোচিকিৎসক তার চেহারার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘সে হয়তো তাকে খুন করে নি। তবে খুন করা তার জন্যে কোনো কঠিন কাজ নয়। খুন করা তার কাছে জলপান করার মতো ব্যাপার’।

আলহামদুলিল্লাহ। স্বাভাবিকভাবেই আমরা খামিনিকে অপছন্দ করি এবং আমরা চাই না যে ইরাকের পতন ঘটুক। আল্লাহর কসম, শিয়াদের হাতে ইরাকের পতন ঘটুক এটা আমরা কিছুতেই চাই না। কারণ ইসলামি বিশ্বে শিয়ারা সবচেয়ে বিপজ্জনক, এমনকি সাদ্দামের চেয়েও বিপজ্জনক। সাদ্দামের অবশ্যই পতন ঘটবে। তিনি জালেম ও উৎপীড়ক। কেননা তিনি ইসলামি উম্মাহর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন। সাদ্দামের পতন ঘটিয়ে আল্লাহপাক মুসলিম উম্মাহর এই ক্ষতকে সুস্থ করবেন, ইনশাআল্লাহ।

অপরদিকে খামিনি ইসলামি বিশ্বকে পদানত করার জন্য নীল নকশা তৈরি করেছেন। খামিনি স্বপ্ন দেখেন তিনি পাকিস্তানের একটা অংশ দখল করবেন। তিনি পাকিস্তানের পশ্চিম অংশটি দখল করতে চান। কারন, তাদের ভাষ্যমতে সে-এলাকায় দশ বা তেরো মিলিয়ন শিয়া বসবাস করে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতেও শিয়াদের অংশগ্রহণ রয়েছে। অর্থনীতিতেও তাদের ভূমিকা বেশ বড়ো। তিনি মনে করেন ইরাকের নাগরিকদের শতকরা পঞ্চাশ জন শিয়া এবং দু-তিন বছরের ভেতরেই সাদ্দামের পতন ঘটবে। তারপর তারা ইরাককে পদানত করবেন এবং আরব উপসাগর নিজেদের দখলে নেবেন। এতে তাদের একটির বেশি দুইটি আঘাতের প্রয়োজন পড়বে না। খামিনি মনে করেন, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চল তাদের সঙ্গেই রয়েছে। কারণ সেখানে সবাই শিয়া। সিরিয়াও তাদের সঙ্গে রয়েছে, কারণ সেখানকার নাসিরিয়া শিয়ারা তাদের সমর্থক। তাছাড়া হাফিজ আল-

আসাদের সঙ্গে তাদের চুক্তি রয়েছে। লেবাননের মুসলমানেরা শিয়া এবং খুবই শক্তিশালী। সুতরাং তারাও তাদের সঙ্গে রয়েছে। দক্ষিণ তুরস্কও তাদের সঙ্গে আছে। সে এলাকায় নাসিরিয়া শিয়ারা বিরাট শক্তি। সেখানে রয়েছে প্রায় তিন মিলিয়ন নাসিরিয়া শিয়া। খামিনি এবং ইরানের শিয়ারা ভাবে তারা একদিন ইসলামি বিশ্বে শিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। কোম নগরীকে কেন্দ্র করে এই সাম্রাজ্য পরিচালনা করা হবে।

একারণেই আমরা চাই না যে, সাদ্দামের পতন ঘটুক। যদিও আমরা তাঁর কুফরির ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

যাই হোক। সাদ্দাম যখন খামিনির এই ঘোষণার কথা শুনলেন, তিনি মন্ত্রিপরিষদ ও দলের নেতাদের সভা আহ্বান করলেন। সাদ্দাম সভায় তাঁর ভাষণে বললেন, 'খামিনি যুদ্ধবিরতি চুক্তির জন্যে শর্ত দিয়েছেন। সেই শর্ত হচ্ছে আমাকে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করতে হবে। আমার মতামত হলো, আমি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে চাই। এতে রক্তপাতও বন্ধ হবে এবং আমাদের দেশও রক্ষা পাবে। আমার ক্ষমতা ত্যাগের মাধ্যমেই আমি রক্তপাত বন্ধ ও দেশকে রক্ষা করতে চাই। এখন আপনাদের মতামত জানতে চাচ্ছি। দয়া করে আপনাদের মতামত পেশ করুন'। কপট চাটুকারেরা বললো, 'আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। একি বললেন আপনি! আপনিই তো দেশ। আপনিই তো ইরাক। আপনি চলে গেলে তো ইরাকও চলে যাবে'। যাদের ভেতরে সামান্য মানবিকতা ও পৌরুষ ছিলো তারা বললো, 'আপনি দেশের কল্যাণের জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আপনি যদি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান তাহলে দেশের কল্যাণে ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপারে আপনার সমকক্ষ কেউ হবে না'। এই গোত্রের লোকদের মধ্যে কবি শফিক কামালিও ছিলেন। তারপর সাদ্দাম বললেন, 'যাঁরা মনে করেন আমার ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত তাঁরা এখানে থাকুন আর বাকিরা চলে যান'। যাঁরা সাদ্দামের ক্ষমতা ত্যাগের ব্যাপারে একমত পোষণ করে সভাকক্ষে থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা কেউ জীবিত ফিরতে পারেন নি। সাদ্দাম তাঁদের সবাইকে হত্যা করেছিলেন। আর শফিক কামালির ভাগ্যে কী ঘটেছিলো? সাদ্দাম কামালিকে বললেন, 'তুমি তোমার জিব বের করো'। কামালি জিব বের করলেন এবং সাদ্দাম নিজ হাতে তাঁর জিব কাটলেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে সাদ্দাম জীবিতদের নির্যাতন করে সুখ পান। শত্রুদেরকে ধরে তাঁর কাছে আনা হয় এবং তিনি তাদেরকে হত্যা করার পূর্বে নাক কাটেন, কান কাটেন, এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলেন।

হ্যাঁ, যা আমি বলতে চাচ্ছিলাম। আমি বলতে চাচ্ছিলাম এইসব নেতা হলেন মসিবত। তাঁরা তাঁদের জাতির জন্যে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক। এই উমাইয়া বিন খাল্‌ফ, আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাব ও অন্যরা মক্কাকে ধ্বংস করে ফেলেছিলো। যাই হোক, আমরা আগের আলোচনায় ফিরে যাই। আবু সুফ্‌য়ান যখন কাফেলা নিয়ে বিপদমুক্ত হলেন, তিনি আরেকটি লোককে মক্কায় পাঠালেন। লোকটি গিয়ে বললো, 'কাফেলা এখন বিপদের আশঙ্কামুক্ত। তোমরা ফিরে যাও'। কুরাইশরা ততক্ষণে মক্কা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিলো এবং এক জায়গায় সমবেত হয়েছিলো। লোকটির কথা শুনে আবু জাহ্‌ল দাঁড়িয়ে গেলো। সে ঘোষণা করলো, 'লাতের কসম, আমরা বদর প্রান্তে উপনীত না হয়ে কিছুতেই ফিরে যাবো না। আমরা সেখানে মদ পান করবো। গায়িকারা সেখানে গান গাইবে এবং নর্তকীরা নাচবে। আমরা উট জবাই করবো এবং ভোজ করবো। গোটা আরব আমাদের উল্লাস শুনবে। আমাদের এই দম্ভ কখনো শেষ হবে না'। কিন্তু দলটি এগিয়ে গেলো কী জন্যে? কেননা এই পরিস্থিতিতে এমন কেউ থাকে যে সবাইকে উত্তেজিত করে। কেননা সব জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষের উত্তেজনাকে প্রশমন করতে পারে না। কিন্তু যেকোনো মূর্খ নাদান গোটা দলকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারে। কুরাইশ দল এগিয়ে গেলো এবং বদর উপত্যাকায় উপনীত হলো। তারা ছিলো মদিনা থেকে বদর উপত্যকার দূরবর্তী প্রান্তে মানে উঁচু ভূমিতে আর মুসলমানরা ছিলেন মদিনা থেকে বদরের নিকটবর্তী প্রান্তে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করতে শুরু করলেন। তিনি আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন না কুরাইশরা কোথায় পৌঁছেছে। যুদ্ধ হবে কি হবে না তাও তিনি জানতেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এক বৃদ্ধকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে শাইখ, কুরাইশরা কোন্ পর্যন্ত পৌঁছেছে?' বৃদ্ধ বললো, 'তোমরা কারা তা আমার কাছে বলার আগে আমি তোমাদের কিছু বলবো না'। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি আমাদেরকে বলো তাহলে আমরাও তোমাদেরকে বলবো'। বৃদ্ধ বললো, 'আমি শুনেছি কুরাইশরা অমুক দিন মক্কা থেকে বের হয়েছে। যদি তারা সত্যসত্যই বেরিয়ে থাকে তাহলে এখন অমুক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমি আরো শুনেছি মুহাম্মাদ অমুক দিন মদিনা থেকে বের হয়েছে। সে যদি সত্যসত্যই বের হয়ে থাকে তাহলে এখন অমুক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেছে'। এসব কথা বলার পর বৃদ্ধ বললো, 'আমি তো সব বললাম, এখন বলো তোমরা কারা'। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমরা 'পানি' থেকে এসেছি'। তারপর হাঁটা শুরু করলেন। অতিশয় বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি ইরাকের পানি থেকে না-কি অন্য কোনো জায়গার পানি থেকে এসেছো? কোন্ দেশের পানি থেকে

তোমরা এসেছো?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোনো উত্তর না দিয়েই চলে এলেন। যুদ্ধের ক্ষেত্রে কথাবার্তায় এই ধরনের কৌশল করা বৈধ। আর রাসুল সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃদ্ধকে সত্যই বলেছেন। কেননা আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন, أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ 'আমি কি তোমাদের তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করি নি?' [সুরা মুরসালাতঃ আয়াত ২০] কুরাইশরা কিছু লোককে তাদের জন্যে পানি সংগ্রহ করতে পাঠালো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হযরত আলি রাঃ, হযরত যুবাইর রাঃ ও হযরত মিকদাদ রাঃ- এই তিনজনকে খবর সংগ্রহের জন্যে পাঠালেন। তাঁরা কুরাইশের কয়েকজন পানি-সংগ্রাহককে দেখতে পেলো। আজকে এ পর্যন্তই। আমার জন্যে এবং আপনাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আগামী কাল ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধের বাকি ঘটনা আলোচনা করা যাবে।

[পর্ব ৪]

বদর যুদ্ধঃ দুই

আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরিফে বলেছেন-

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

'তাদের বৃত্তান্ত বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে আছে শিক্ষা'। [সুরা ইউসুফঃ আয়াত ১১১]

তাই আমরা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সিরাত অধ্যয়ন করবো, সাহাবায়ে কেরামের জীবন-কাহিনি পাঠ করবো, আমরা সেসব থেকে ইনশাআল্লাহ শিক্ষা গ্রহণ করবো, উপদেশ গ্রহণ করবো, অনুকরণ করবো এবং সান্ত্বনা লাভ করবো। আমরা এখনো বদর যুদ্ধের ছায়াতলে আছি। সেটা ছিলো সত্য-মিথ্যার মীমাংসাকারী দিবস। বদর যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পতাকা ছিলো সাদা রঙের। তাঁর সঙ্গে আরো দুইটি কালো রঙের নিশান ছিলো। একটি বহন করছিলেন হযরত আলি রাঃ আর অপরটি বহন করছিলনে হযরত সা'দ বিন মুআয রাঃ। পতাকা ও নিশানের (اللواء ও الراية) মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে- এই পার্থক্যের বিষয়টি কতিপয় আলেম ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের ভাষায়- পতাকা মেলে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয়। আর

নিশান বর্শার মাথায় বহন করা হয় এবং তার ওপর একটি গিট থাকে। তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পতাকার রঙ ছিলো সাদা আর নিশান ছিলো কালো। মনে হয় মক্কা বিজয়ের সময়েও একই রঙের পতাকা ও নিশান ছিলো। অপর দিকে মুশরিকদের পতাকা বহন করছিলো নদর বিন হারেস। সে রুস্তম ও ইসফানদিয়ারের কাহিনি সংকলন করেছিলো। এসব গল্প সংগ্রহ করে মক্কায় নিয়ে এসেছিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন, নদর সবাইকে ডেকে বলতো, 'তোমরা আমার কাছে আসো, আমি তোমাদের রুস্তমের গল্প শোনাবো'। সে লোকদেরকে রুস্তমের গল্প শোনাতো এবং গল্পের শেষে লোকদের জিজ্ঞেস করতো, 'কোনটা ভালো গল্প? মুহাম্মদ যেটা বলে সেটা না-কি আমারটা?' লোকেরা বলতো, তোমারটাই ভালো গল্প।

এ-প্রসঙ্গে আল্লাহপাক কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ-প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি'। [সুরা লুকমানঃ আয়াত ৬]

এটা ছিলো নদর বিন হারেস। নদর বিন হারেস বন্দি হওয়ার পর তাদের পতাকা বহন করলো আবু আযিয। আবু আযিয ছিলো মুসআব বিন উমায়েরের ভাই। তিনিও পতাকা বহন করছিলেন। মুসআব বিন উমায়ের বহন করছিলেন মুসলমানদের পতাকা আর তাঁর ভাই আবু আযিয করছিলো মুশরিকদের পতাকা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সত্তরটি উট ও দুইটি ঘোড়া ছিলো। একটি ঘোড়া যুবাইর রাঃ এর জন্যে, আরেকটি ঘোড়া মিকদাদ রাঃ-এর জন্যে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযানে বের হয়ে যাওয়ার সময় আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমকে মদিনায় রেখে যান। আমর বিন উম্মে মাকতুম-এর এক বর্ণনায় আছে, আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম নামায পড়ানোর জন্যে থেকে গিয়েছিলেন। তিনি লোকদের নামায পড়াতেন। বদরের দিকে রওয়ানা হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু লুবাবাকে রাস্তা থেকে মদিনায় ফিরিয়ে দেন এবং তাঁকে মদিনার আমির নিযুক্ত করেন।

আগের আলোচনায় আমি সা'দ রাঃ এর কথা বলি নি। মিকদাদ রাঃ-এর কথা বলেছি। কিন্তু বিন হিশামের বর্ণনায় সা'দ রাঃ-এর কথাও আছে। তাঁরা গিয়ে আসলাম ও আরিদকে ধরে ফেললেন। তারা কুরাইশদের জন্য পানি সংগ্রহ করছিলো। তাঁরা এই দুইজনকে ধরে মুসলমানদের কাছে নিয়ে এলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নামায পড়ছিলেন। মুসলমানরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু সুফ্য়ানের কাফেলা কোথায়?' আসলাম ও আরিদ বলল, 'আমরা কুরাইশের পানি-সংগ্রাহক। দলের লোকদের জন্য পানি সংগ্রহ করি'। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। এরা মিথ্যা বলছে মনে করে মুসলমানরা এদেরকে খুব পেটালেন। এমনকি তাদেরর গায়ে দাগ পড়ে গেলো। মার খেয়ে তারা বলল, 'আমরা আবু সুফ্য়ানের লোক'। এই কথা বলার পর মুসলমানরা তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। ইতোমধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করলেন। তিনি বললেন, 'তারা যখন সত্য বলেছে তখন তোমরা তাদেরকে পিটিয়েছো। আর যখন মিথ্যা বলেছে তখন ছেড়ে দিয়েছো। তারা তো সত্যই বলেছে। তারা আসলে কুরাইশের লোক'। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোক দুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কুরাইশ সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দাও'। তারা বললো, 'আপনারা বদরের দূরবর্তী প্রান্তে যে বালির টিলা দেখছেন, কুরাইশরা তার পেছনে আছে। বালির এই টিলাকে বলা হয় আকানকাল'। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কুরাইশরা সংখ্যায় কেমন?' লোক দুটি বললো, 'অনেক'। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সংখ্যায় তারা কতো জন হবে?' লোক দুটি বললো, 'আমরা জানি না'। রাসসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তারা দিনে কয়টা উট জবাই করে?' লোক দুটি বললো, 'নয়টা বা দশটা'। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এদের সংখ্যা নয়শ বা এক হাজার হবে'। তারপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাদের মধ্যে নেতারা কে কে আছে?' লোক দুটি বললো, 'উতবা বিন রবিয়া, শায়বা বিন রবিয়া, আবুল বুখতুরি বিন হিশাম, হাকিম বিন হিযাম, নাওফাল বিন খুয়াইলিদ, হারেস বিন আমের, তায়িমা বিন আদি, সুহাইল বিন আমর, নদর বিন হারেস এবং তারা আরো অনেকের নাম বললো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলো তোমাদের সামনে পরিবেশন করেছে'।

বদর যুদ্ধ কুরাইশদের জন্য ছিল চরম আঘাত আর মুসলমানদের জন্যে ছিলো আল্লাহ তাআলার বড়ো নেয়ামত। কারণ শিরকের সরদাররা ও কুফরের নেতারা সবাই বা অধিকাংশ বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো এবং মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছিলো। বাস্তব পরিস্থিতিটা ছিলো সেরকম যেমন আল্লাহপাক কুরআনে বলেছেন-

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ [৮:৬]وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ৮:৭]]

[لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ [৮:৮

‘সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হচ্ছিলো ওদেরকে যেনো মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো আর ওরা মৃত্যুকে দেখছিলো। স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর চাচ্ছিলেন যে, তিনি তাঁর কালিমা দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদেরকে নির্মূল করেন। এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না’। [সুরা আনফালঃ আয়াত ৬-৮]

আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই নির্ধারিত ছিলো যে, এদের সবাইকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আর এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিলো যে আবু জাহ্‌ল মক্কায় ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানাবে। এইসব নেতাদের ধ্বংস হওয়ার জন্যে এবং মুশরিকদের শত্রুতা থেকে মুসলমানদের স্বস্তির জন্যে দল দুটির মুখোমুখি হওয়ার বিকল্প ছিলো না। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলো তোমাদের সামনে পরিবেশন করেছে’। তিনি এই কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, আল্লাহপাক মক্কার শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে তোমাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

বনি মুত্তালিব গোত্রের জাহিম বিন সালত বিন মুখরিজাহ বিন আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, ‘একজন লোক উটে আরোহণ করে এলো। লোকটি মক্কার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো, আমর বিন হিশাম নিহত হয়েছে, উতবা বিন রবিয়া নিহত হয়েছে, শায়বা বিন রবিয়া নিহত হয়েছে, আবুল বুখতুরি বিন হিশাম নিহত হয়েছে। তারপর লোকটি উট থেকে নামল এবং উটের পিঠে আঘাত করলো। উটটি এগিয়ে গিয়ে একটি তাঁবুতে প্রবেশ করলো। এভাবে উটটি প্রত্যেক তাঁবুতে প্রবেশ করলো এবং তার শরীরের সব রক্ত শুকিয়ে গেলো। এই কাহিনী আবু জাহ্‌লকে বলা হলো। সে বললো, ‘আরে এও দেখছি আবদুল মুত্তালিবের বংশে নবী বনে গেছে। আতিকা নবী হলো। মুহাম্মাদ নবী হলো। এখন দেখা যায় এই ব্যাটাও নবী বনে গেছে। আগামী কালই

আমরা জানতে পারবো কে নিহত হয়’। আবু জাহ্‌ল তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাম্ভিকতা, রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতা ও অহংকার বজায় রেখেছিলো

[পর্ব ৫]

সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ

এখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দূরবর্তী প্রান্তরে বালুর টিলার পেছনে কুরাইশদেরকে দেখতে পেলেন। তাই তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাঁরা যুদ্ধে জড়াবেন না-কি জড়াবেন না। তিনি ঘোষণা করলেন, ‘হে লোকেরা, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও’। এই ঘোষণা শুনে আবু বকর ও উমর রাঃ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা ভালো ভালো কথা বললেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে রইলেন এবং তাঁদের জন্যে কল্যাণের দোয়া করলেন। তারপর মিকদাদ বিন আমর উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, বনি ইসরাইল মূসা আঃ-কে যে ধরনের কথা বলেছিলো আমরা আপনাকে সে ধরনের কথা বলবো না। তারা বলেছিলো- فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ‘বরং তুমি এবং তোমার রব যাও এবং তোমরা যুদ্ধ করো আর আমরা এখানেই বসে থাকবো’। [সুরা মায়িদাঃ আয়াত-২৪] বরং আমরা আপনাকে বলবো, আপনি এবং আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো।

তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে লোকেরা, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও’। এবার সা’দ বিন মুআয রাঃ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ যেনো আপনি আনসারদেরকে চাইছেন’। আসলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন যে, ‘আনসাররা আমাদেরকে বলেছিলো, আমরা আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আপনারা মদিনায় আসেন, আমরা আপনাদের নিরাপত্তা দেবো ও হেফাযত করবো। আর এখন আমরা মদিনার বাইরে। সুতরাং এখানে তো প্রতিশ্রুতি কার্যকর নয়’। হযরত সা’দ রাঃ এবার বললেন, ‘আল্লাহর কসম ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাদেরকেই চাচ্ছেন’। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই’। সা’দ রাঃ বললেন, ‘আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য। এসব ক্ষেত্রে আনুগত্য ও অনুসরণের ব্যাপারে আমরা

আপনার কাছে অঙ্গীকার করেছি, প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা বাস্তবায়িত করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আগামীকাল আপনি শত্রুর মুখোমুখি হলে আমরা বিষটি অপছন্দ করব না। যুদ্ধে আমরা ধৈর্যশীল এবং লড়াইয়ে আমরা সত্যবাদী। আল্লাহ তালা হয়তো আমাদের থেকে তাই চাচ্ছেন যার দ্বারা তিনি আপনার চক্ষু শীতল করবেন। আল্লাহর বরকতে আপনি আমাদেরকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ুন'।

সা'দ রাঃ-এর কথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আল্লাম খুশি হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'তোমরা বেরিয়ে পড়ো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহপাক আমাকে দুটি দলের যে কোনো একটি আমাদের আয়ত্তাধীন হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর কসম, যেনো আমি এখন কুরাইশের নিহতদের দেখতে পাচ্ছি। এখানে আবু জাহ্‌ল নিহত হবে, এখানে উতবা নিহত হবে, এখানে শায়বা নিহত হবে, এমনিভাবে আরো অনেকে নিহত হবে'। বর্ণিত আছে, জনৈক আনসার সাহাবি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-স্থানটির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, সে-স্থানটিকে কেউ অতিক্রম করতে পারে নি। আর আমরা সা'দ বিন মুআযের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম'।

সা'দ বিন মুআয ছিলেন ইসলামি মনীষা ও জ্ঞান, দাওয়াহ ও আকিদার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। আল্লাহপাক তাঁকে ভালোবেসেছিলেন এবং তাঁর জাতিও তাঁকে ভালোবেসেছিলো। বনি আবদুল আশহালের প্রতিটি ঘরে ইসলাম পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যম ছিলেন তিনি। তিনি সত্যসত্যই নেতা ছিলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামের বাণী নিয়ে তাঁর জাতির কাছে গিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'হে আবদুল আশহালের সম্প্রদায়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে আমার এবং তোমাদের মুখ দেখাদেখি হারাম'। তাঁর এই ঘোষণার পর বনি আবদুল আশহালের প্রতিটি ঘর ইসলামে প্রবেশ করেছিলো।

হ্যাঁ, এইসব নেতা তাঁদের জাতির কল্যাণসাধনে নিবেদিত থাকেন। তাঁরা যখন সরল ও শুদ্ধ পথে চলেন, তাঁদের জাতিও সরল ও শুদ্ধ পথে চলেন। আফগানিস্তানে আমাদের সঙ্গে একজন নেতা ছিলেন, তাঁর নাম ছিলো শায়খ সালেহ। শায়খ সালেহ সানাহ সম্প্রদায়ের গোত্রগুলোর নেতা ছিলেন। অবশ্য আমরা তাঁকে শায়খ সাইয়াফ বলে ডাকতাম। গত বছর শাওয়াল অথবা রমযানের শেষে ও শাওয়ালের শুরুতে আমরা জাজি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম। একদিন দুপুরে আমরা তাঁকে বললাম, শায়খ সাইয়াফ, আপনি আমাদেরকে দুপুরের খাবার দেরি করে দিচ্ছেন'। তিন বললেন, 'আমাদের কাছে রুটি নেই। শিয়াদের একটি দল ডাকাতি করে আমাদের সব নিয়ে গেছে'। যুদ্ধের সময় শিয়ারা একটি এলাকা [এটি ছিলো পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকা] রাস্তা বন্ধ করে দিলো। তারা ঘোষণা করলো, আমরা মুজাহিদদের গাড়ি চলাচল করতে দিবো না। শায়খ সালেহ তখন পাকিস্তান সরকারকে সতর্কবার্তা পাঠালেন। তিনি পাকিস্তান সরকারকে জানালেন,

শিয়ারা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। আপনারা যদি রাস্তা খুলে না দেন তাহলে আমরা এগারোশো সশস্ত্র যোদ্ধা শক্তিবলে রাস্তা খুলে নেবো'। পাকিস্তান সরকার তাঁকে জানালো, আমাদের একদিন সময় দিন। পাকিস্তান সরকারকে একদিন সুযোগ দেয়া হলো। দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক নামলো এবং শক্তি প্রয়োগ করে রাস্তা খুলে দিলো। এই ঘটানার পর জামাল শিয়া পালিয়ে গেলো। শিয়াদের নেতা জামাল সরকারের মুখোমুখি না হয়ে পালিয়ে গেলো এবং পথ খুলে দিলো। ঈদুল আযহার সময় শিয়ারা আবার ফিরে এলো এবং পথ বন্ধ করে দিলো। শায়খ সালেহ তখন হজে ছিলেন। সানাহ সম্প্রদায়ের অন্যান্য নেতার চেয়ে শায়খ সালেহ ছিলেন অনন্য। তিনি সচ্চরিত্র ও সংযমী ছিলেন। তাঁর যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। তবে আমরা আল্লাহর ওপরে কাউকে পবিত্র বলতে চাই না। তিনি মুজাহিদদেরকে খাওয়াতেন। তিনি শুধু আমাদেরকে এই কারণ ভালোবাসতেন যে আমরা মুজাহিদ। তিনি আমাদের থেকে কিছুই দাবি করতেন না। একদিন আমরা তাঁকে বললাম, ' এই বছর আমরা আপনাকে হজের দাওয়াত দিচ্ছি'। মানে গত বছর। তিনি বললেন, 'আমি চেয়েছিলাম, আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হবে শুধু আল্লাহর জন্যে। আমি আপনাদের কাছে দুনিয়ার কিছু দাবি করি নি। তবে আপনারা আমাকে যে-উৎসের সন্ধান দিয়েছেন আমি তা বন্ধ করতে পারবো না। হজের মধ্য দিয়ে আপনারা আমার কাছে এসেছেন। তাই আপনাদের এই দাওয়াতকে আমি গ্রহণ না করে পারি না'। যাই হোক তিনি সে-বছরই হজে গেলেন। এদিকে শিয়ারা দ্বিতীয় বার পথ বন্ধ করে দিলো। তাঁর পুত্র সালিম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সালিম ছিলেন 'জামায়াতে ইসলামি'র সদস্য। আমি উসতাদ আবুল আলা মওদুদির জামায়াতে ইসলামির কথা বলছি। শায়খ সালিম ছিলেন অন্ধ। শিয়াদের সঙ্গে এক যুদ্ধে তিনি তাঁর চোখ হারিয়েছেন। তিনি হজের সময়ই তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তিনি জানালেন, 'শিয়ারা আবার মুজাহিদদের পথ বন্ধ করে দিয়েছে'। শায়খ জানালেন, 'তোমরা শিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করো'। এই যুদ্ধ লাঠির যুদ্ধ ছিলো না।

বিএম ১২ সক্রিয় হয়ে উঠলো। বুলেট, রিকয়েললেস রাইফেল, আরবিজি ও কালাশনিকভ গর্জন করে উঠলো। এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত শিয়া ও সানাহ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহ রূপ নিলো। আল্লাহপাক শিয়াদের পরাস্ত করলেন। সানাহ সম্প্রদায় বারোটি গ্রাম দখল করলো এবং সেগুলো গুঁড়িয়ে দিলো। আল্লাহপাক শিয়াদের লাঞ্ছিত করলেন এবং তাদের শক্তি ও দম্ভ চূর্ণ করে দিলেন। সেই দিন থেকে শিয়ারা গর্ত ও সুড়ঙ্গে আত্মগোপন করলো। এখন সেটাই তাদের আশ্রয়স্থল। সেই আশ্রয়স্থল থেকে তাদের খুব কম সংখ্যকই বের হতে পেরেছে।

আপনি যদি জাজিতে যান এবং সেই এলাকা পরিদর্শন করেন তাহলে প্রতিটি গ্রামকে বিধ্বস্ত দেখবেন। শায়খ সালেহ এবং তাঁর সন্তানেরা সেইসব গ্রামকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সে-সময়

সেখানে কাওসে আবয়াদের কাছে একজন শিয়া সামরিক কর্মকর্তা ছিলো সে মুজাহিদদের জন্যে বিভিন্ন সঙ্কট সৃষ্টি করতো। শায়খ সালেহ তাকে বললেন, 'তুমি আরবদের জন্য সঙ্কট সৃষ্টি করবে না। এবং সেটাই তোমার জন্যে ভালো হবে। তাছাড়া আমি ভালো করেই জানি তোমার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নিতে হবে'। সেই দিন থেকে তারা আমাদের জন্যে রাস্তা খুলে দেয়। আমরা পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে আসতাম।

[পর্ব ৬]

সা'দ বিন মুআয ছিলেন অনন্য দৃষ্টান্ত

বাস্তব সত্য এই, নেতা ও সরদাররা যখন সত্যবাদী ও সৎ হন, আল্লাহপাক তাদের মাধ্যমে ঈমান ও আকিদা এবং আদর্শ ও চেতনার অনেক কল্যাণ করেন। সা'দ বিন মুআয রাঃ পৌরুষ, আত্মসম্মানবোধ, মর্যাদা ও মানবিকতার প্রতীকরূপে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভাস্বর ছিলেন। বনু কুরায়যার সঙ্গে তাঁর ঘটনা একজন সত্যবাদী নেতার ঘটনা। বনু কুরায়যাকে অবরোধ করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, তোমরা আমার নির্দেশমত দুর্গ থেকে নেমে আসো। তারা বললো, না, আমরা সা'দ বিন মুআযের নির্দেশমত নেমে আসবো। জাহেলি যুগে সা'দ বিন মুআয তাদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ ছিলেন। তাই তারা আশা করেছিলো, সা'দ রাঃ তাদের ব্যাপারে লঘু নির্দেশ দেবেন।

খন্দকের যুদ্ধে সা'দ বিন মুআয রাঃ কী বলেছিলেন? সে-যুদ্ধে আহত হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি যদি আমাদের ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি টেনে থাকো তাহলে আমাকে তোমার কাছে উঠিয়ে নাও'। তিনি আরো বলেছিলেন, 'বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার চোখ শীতল করার আগে আমার মৃত্যু দিও না'।[৫] খন্দকের যুদ্ধই ছিলো শেষ যুদ্ধ যেখানে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছিলো। খন্দক যুদ্ধের পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, الآن نغزوهم ولا يغزونا 'এখন থেকে আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করবো, তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করবে না'।[৬]

আল্লাহপাক সা'দ রাঃ-এর দোয়ার প্রথম অংশ-'কুরাইশের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমাকে উঠিয়ে নিন'।–কবুল করেছিলেন। আর দোয়ার দ্বিতীয় অংশ-'বনু কুরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল করুন'।–কবুল হওয়ার ঘটনা এমন- বনু কুরায়যা বললো, আমরা সা'দ বিন মুআযের নির্দেশমত নামবো। তারা তাঁকে নিয়ে এলো। তখন তাঁর যখমের বিষয়টি গোপন ছিলো। অর্থাৎ আল্লাহপাক তাঁর যখমের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ রেখেছিলেন। সা'দ রাঃ তখন মসজিদ প্রাঙ্গনে অবস্থিত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি আওস গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হলে একদল আওস তাঁর দিকে এগিয়ে এলো এবং বললো, 'হে সা'দ, আপনি আপনার অধীনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করুন। এরা আমাদের সঙ্গী ছিলো। আপনি তাদেরকে ভুলে যাবেন না'। সা'দ রাঃ ঘোষণা করলেন, 'এখন সা'দের [শেষ] সময় ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহর ব্যাপারে কারো তিরস্কার তাকে স্পর্শ করবে না। আমি বনু কুরায়যার ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছি, তাদের পুরুষদের হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদের বন্দি করা হোক এবং তাদের ধন-সম্পদ গনিমতে পরিগণিত করা হোক'।[৭] হযরত সা'দের ফয়সালা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাত আসমানের ওপরে আল্লাহপাকের যে-রায় ছিলো, তুমি সে-রায়ই ঘোষণা করেছো। এটাই ছিলো আল্লাহপাকের সিদ্ধান্ত।

মানুষ ইবাদত ও সৎকাজের মধ্য দিয়ে পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও সততার বিভিন্ন স্তরে উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে। অবশেষে সে এমন পর্যায়ে পৌছে, যখন সে আল্লাহর নামে শপথ করে আল্লাহপাক তার শপথ পূরণ করেন আল্লাহপাক তাকে ভালোবেসে ঘোষণা করেন, 'যদি সে আমার কাছে চায়, অবশ্যই আমি তাকে দিই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, অবশ্যই তাকে আমি আশ্রয় দিই'। এই রায় ঘোষণার পর হযরত সা'দ রাঃ এর যখম থেকে তীব্র রক্তক্ষরণ হলো এবং তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। সাহাবাগণ তাঁর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যবান বিশাল দেহের অধিকারী। তাঁরা বললেন, সা'দকে তো হালকা মনে হচ্ছে। তাঁদের কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

إن له حملة غيركم, لَقَدِ اهْتَزَّ عرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ معاذ

'তোমরা ছাড়া তাঁর আরো বহনকারী রয়েছে। সা'দের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে'।[৮]

সুবহানাল্লাহ! মাটির তৈরি একজন সাধারণ মানুষ; দুর্গন্ধময় তরল থেকে যাঁর সৃষ্টি, তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে! কী সম্মান ছিলো তাঁর? কোন উচ্চতা ছিলো তাঁর? এই দীন ও বিশ্বাসকে ধারণ করে এই মাটির সৃষ্ট মানুষটি কোন উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিলেন? কার জন্য রহমানের আরশ কেঁপে উঠেছে? হযরত সা'দ রাঃ-এর মৃত্যুতে। ফেরেশতারা তাঁর রুহকে

পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছেন। কবরের শাস্তি থেকে কেউ যদি মুক্তি পেয়ে থাকেন, তিনি হলেন হযরত সা'দ রাঃ।

সা'দ বিন মুআয রাঃ-আল্লাহপাক তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন- ছিলেন এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। মদিনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁদের ওপর নির্ভর করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন সা'দ রাঃ। তিনি ছিলেন তাঁর প্রধান খুঁটি। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন, 'আল্লাহপাক হয়তো আমার থেকে এমন বিষয় প্রকাশ করবেন যা আপনার চক্ষুকে শীতল করবে'। তিনি বলেন নি, হে সমুদ্রের মৎসকুল, তোমরা ক্ষুধার্ত হও, আমরা তাদেরকে নিক্ষেপ করবো, আমরা তাদেরকে নিক্ষেপ করবো। আমরা অচিরে ইহুদিদেরকে সমূলে বিনাশ করবো। বরং তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহপাক হয়তো আমার থেকে এমন বিষয় প্রকাশ করবেন যা আপনার চক্ষুকে শীতল করবে।

সাহাবাগণ রাদিয়াল্লহু আনহুম বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি ছিলেন ন্যায়বান ও নিষ্ঠাবান। তাঁরা আগেভাবে কোনো কিছু জানার চেষ্টা করতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন, মানুষের হৃদয়সমূহ আল্লাহর জ্ঞানাধীন রয়েছে। তাঁরা জানতে চেষ্টা করতেন না, কীভাবে কার ভাগ্যলিপি রচিত হচ্ছে। আনাস বিন আন-নাদার রাঃ বদর যুদ্ধ থেকে চলে গিয়েছিলেন। এ-কারণে তিনি অনেক তিরস্কারের শিকার হন। তখন তিনি কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'যদি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে থাকি, তবে আল্লাহপাক অবশ্যই দেখেন আমি কী করি। অবশ্যই আল্লাহপাক দেখেন আমি কী করি'। সাহাবিগণ আঁর শরীরে আশিটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন পেয়েছিলেন। সা'দ বিন মুআয রাঃ বলেন, 'আমি আনাস বিন নাদারের সঙ্গে ওহুদ প্রাঙ্গণে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "হে আবু আমর, ওহ্ আবু আমর, জান্নাত। আমি জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। আমি ওহুদ প্রান্তর থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি"'। তিনি জান্নাতের ঘ্রাণ পেয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি দুনিয়াতেই জান্নাতের ঘ্রাণ পেয়েছিলেন। হে লুকমান [একজন আরব মুজাহিদ], তুমি এখানে ঘুমিয়ে আছো। অথচ আনাস বিন নাদার বলেছেন, 'আমি ওহুদের প্রান্তর থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি'।

মুজাহিদরা সফিউল্লাহ আফযালি সম্পর্কে আমাকে বলেছেন। তিনি আফগানিস্তানে হেরাত এলাকার কমান্ডার ছিলেন। তিনি শাহাদাত বরণ করার আগে যখন তাঁর গাড়িতে প্রবেশ করলেন, বললেন, 'আমি আশ্চর্য এক ঘ্রাণ পাচ্ছি। সম্ভবত সেটা শাহাদাত আর জান্নাতের ঘ্রাণ'। এই কথা বলার প্রায় দুই ঘন্টা পরেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত সা'দ বিন মুআয রাঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর জন্যে একটি আরিশ [ছাপ্পর বা তাঁবু] নির্মাণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৯] তিনি তাঁকে বলেছিলেন, হে আল্লাহর

রাসুল...হে আল্লাহর নবী... আমরা কি আপনার জন্যে একটি আরিশ নির্মাণ করবো না? আপনি তাতে অবস্থান করবেন করবেন। আমরা সেখানে আপনার বাহন প্রস্তুত রাখবো। তারপর শত্রুদের মোকাবিলা করবো। আল্লাহপাক যদি আমাদের সম্মানিত করেন এবং কাফেরদের ওপর আমাদের বিজয় দান করেন, তাহলে আমরা যা ভালোবাসি তাই হবে। আর অন্য কিছু ঘটলে আপনি আপনার বাহনে আরোহণ করে আমাদের পশ্চাদ্‌বর্তী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবেন। কিছু মানুষ তো [যুদ্ধ থেকে বিরত থেকে] আপনার পশ্চাতে রয়েই যাবে। হে আল্লাহর নবী, আমরা কি আপনাকে তাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসি না? তারা যদি ধারণা করতো আপনি যুদ্ধে মুখোমুখি হচ্ছেন, তাহলে তারা পেছনে থেকে যেতো না। আল্লাহপাক যদি তাদের মাধ্যমে আপনাকে রক্ষা করতেন, তারা আপনার মঙ্গল কামনা করতো এবং আপনার সঙ্গে জিহাদ করতো'। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ রাঃ-এর এসব কথা শুনে তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁর জন্যে কল্যাণের দোয়া করেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্যে একটি আরিশ বানানো হয়।

---

৫) খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ দলের ইবনুল আরাকা সা'দ বিন মুআযকে তীর ছুঁড়েছিলো। সে তাঁকে বলেছিলো, 'তুমি এটি ধরো। আমি ইবনুল আরাকা'। তখন সাদ বিন মুআয বলেছিলেন, 'আল্লাহ তোমার চেহারাকে আগুনে ঝলসাবেন'। তারপর তিনি এই দোয়া করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে বনু কুরায়যা মুসলমানদের সঙ্গে যুক্তি ভংগ করে কুরাইশের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো। দেখুনঃ তাফসিরে বিন কাসির, সুরা আহযাব।

৬) মুসনাদে আহমাদ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬২; সহিহুল বুখারি, হাদিস নং ৪১০৯।

৭) আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা, আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম (মিসরঃ মাতয়াবা মুস্তফা আলবাবি, ১৯৫৫) পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪০; সহিহুল মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭।

৮) আল-আস্মা ওয়াস সিফাত, আল-বাইহাকি, হাদিস ৮১০,৮১১; সহিহুল মুসলিম, হাদিস ১৯১৫।

৯) বদরের পুরনো কূপের নিকট একটি উচ্চ স্থান ছিলো। এখানে দাঁড়ালে পুরো রণাঙ্গন দৃষ্টিগোচর হতো। সাহাবিগণ এই জায়গায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্যে একটি ছাপ্পর নির্মাণ করেছিলেন। এটাকেই আরিশ বলা হয়। এই আরিশের ভেতর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে আবু বক্র রাঃ ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হযরত সা'দ বিন মুআয রাঃ রাসুলের দেহরক্ষী হিসেবে আরিশের দরজায় নগ্ন তরবারি হাতে পাহারায় ছিলেন। সিরাতে ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬২০-৬২১।

[পর্ব ৭]

জিহাদের ময়দানে দোয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন মক্কার কুরাইশ বাহিনী আকন্কল টিলার আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। এই দেখে তিনি আরিশের ভেতর দোয়ায় মগ্ন হলেন। তিনি দোয়া করলেন-

اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلاأها, وفخرها تُجادل وتُكذِّب رسولك, اللَّهُمَّ فنصرك الذي وعدتني, اللهم أحنِهم الغداه

হে আল্লাহ, এই কুরাইশ বাহিনী অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এগিয়ে আসছে। তারা তোমার নবীর সঙ্গে বিতণ্ডা করেছে এবং তাকে অস্বীকার করেছে। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সাহায্যের যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ, প্রত্যুষেই তাদেরকে ধ্বংস করো।[১০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলায় তন্ময়-বিভোর হয়ে দোয়া করেই যেতে লাগলেন। সেটা ছিলো জুমআর রাত। রমযান মাসের এওতেরো তারিখের রাত। এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেলো। তিনি টেরও পেলেন না। আবু বকর রাঃ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন- بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার প্রতিপালকের কাছে মিনতি-অনুনয় জানানোয় ক্ষান্ত হোন। আল্লাহপাক আপনাকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন'। সুবহানাল্লাহ! আবু বকর রাঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি নিজের ওপর দয়া করুন। আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন। তিনি আপনাকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। আপনার প্রতিপালকের কাছে অনুনয়-মিনতি জানানোয় ক্ষান্ত দিন।

রাসুলের দেহ থেকে চাদর পড়ে গিয়েছিলো। তিনি কিছুই টের পান নি। তিনি দোয়ায় মগ্ন-বিভোর ছিলেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা কর্তৃক শক্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত নবী ছিলেন। তিনি এই দীনের বিজয়ের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত নবী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্ব-প্রতিপালকের হেফাযতে রক্ষিত নবী। অথচ তিনি সারারাত দোয়ায় মগ্ন ছিলেন। কোন রাত? রমযান মাসের সতের তারিখের রাত। তিনি কী করেছিলেন সে-রাতে। সারারাত মহান আল্লাহর কাছে দোয়ায় মগ্ন ছিলেন।

মিসরীয় সেনাবাহিনী জুন মাসের পঞ্চম রাতে কী করছিলো? চারশো সেনা কর্মকর্তা সারারাত নোংরামী, নির্লজ্জতা ও মদে নিমজ্জিত ছিলো। নষ্টা নর্তকী তাদের জন্যে নেচেছিলো। বারুখ নাদিল- এই ইহুদি বারুখ নাদিল ১৯৫৪ সাল থকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মিসরীয় সেনাবাহিনীর উপদেষ্টা ছিলো। একটি মুসলিম দেশের বিমানবাহিনীর উপদেষ্টা ছিলো একজন ইহুদি!-তার

تحطمت الطائرات عند الفجر/ প্রত্যুষে বিমানগুলো ধ্বংস্প্রাপ্ত হয়েছে গ্রন্থে সে বলেছে, ‘আমি রাতের বেলা একটি পার্টির আয়োজন করলাম। নর্তকী তাতে নেচেছিলো। রাত দুটোর সময় এই পার্টি শেষ হয়। আমি শঙ্কা করি, যদি এখন তারা বাড়িতে ফিরে যায় তাহলে ভোর পাঁচটায় প্রথম যে-বিমান-হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই হামলার সময় তারা জেগে যাবে। আমি দ্রুত চিন্তা করি এবং পার্টিকে অতিরিক্ত সময়ে গড়িয়ে দেয়ার একটা বুদ্ধি পেয়ে যাই। আমি সেনাকর্মকর্তাদের দুই দলে ভাগ করি; পুরুষ কর্মকর্তাদের একদল, নারী কর্মকর্তাদের আরেকদল। পুরুষ কর্মকর্তাদের বলি তোমরা হলে মিসরীয় মিগ আর নারী কর্মকর্তাদের বলি, তোমরা হলে ইসরাইলি মিরাগ। আমি এখন দেখতে চাই মিগ কীভাবে মিরাগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মিগ মিরাগের ওপর মানে পুরুষ কর্মকর্তারা নারী কর্মকর্তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ভোর চারটা পর্যন্ত মউজ ও মাস্তিতে নিমজ্জিত থাকে’। বারুখ নাদিল আরো বলে, ‘নর্তকীর ব্যাপারে আমার আর সিদকি মাহমুদের মধ্যে মতভেদ ঘটে। সিদকি মাহমুদ বিমানবাহিনীর বড়ো কর্মকর্তা’। সে বলে, ‘ভোর চারটার সময় সেনাকর্মকর্তারা মাতাল ও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে যায়। তারা নিজেদের বিছানায় ছুঁড়ে দেয় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। কায়রোর সব বিমানবন্দর ও বিমান জ্বালিয়ে দেয়ার আগে তারা জাগতে পারে না’। বারুখ নাদিল এই বলে তার কাহিনী শেষ করে, ‘মিসরীয় বিমানবন্দর আর বিমানগুলো কীভাবে পুড়ছে তা দেখার জন্যে আমি একটি বিমানে চড়ে কায়রোর আকাশে চক্কর দিই। আমার দেখতে কোন ভুল হয় না যে জ্বালিয়ে দেয়া বিমান ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানবন্দর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে’।

আবদুন নাসেরের ভূমিকা ছিলো? মার্কিন রাষ্ট্রদূত- বিদায়ি পত্রে- তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। বারুখ নাদিল বলে, ‘সন্ধ্যা সাতটায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত আবদুন নাসেরের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাকে অনুরোধ করে, আপনি কোনো আক্রমণের নির্দেশ দেবেন না। ইসরাইলি আক্রকমণের দুই ঘন্টা আগে রুশ রাষ্ট্রদূত আবদুন নাসেরের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং বলে, আপনি কোনো আক্রমণ চালাবেন না। ফজরের নামায আদায়ের জন্যে তারা তাকে ভোরেই জাগিয়ে দেয়!’

যুদ্ধের রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারারাত ইবাদত করার কারণে, দোয়ায় তন্ময়-নিমগ্ন থাকার কারণে এতোটাই আত্মবিস্মৃত ছিলেন যে, তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেলেও তিনি টের পান নি। আবু বকর রাঃ রাসুলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বলেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার প্রতিপালকের কাছে মিনতি-অনুনয় জানানোয় ক্ষান্ত হোন’। আর এদিকে যুদ্ধের আগের রাতে মিসরের সামরিক কর্মকর্তা সিদকি মাহমুদ ইহুদি বারুখ নাদিলের সঙ্গে এক নর্তকীর [সম্ভোগের?] ব্যাপারে তর্কবিতর্ক করে।...

যাই হোক। আল্লাহপাক বলেছেন-

يسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَآ يُؤمِنُونَ بِها وَلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقّ أَلَآ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعتِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدِ

‘যারা তা [কিয়ামত] বিশ্বাস করে না তারাই তা তরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা তা ভয় করে এবং জানে তা সত্য। জেনে রাখো, কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে’। [সুরা শূরা, আয়াত ১৮]

হ্যাঁ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। আর আবু খালেদ ও তার দলের একটিই আহবান ছিলো, আল্লাহর কসম, তোমরা বের হবে না। এই আহ্বানই তাদের ছিলো। মিসরীয় সেনাবাহিনীর প্রথম ট্যাঙ্কবহর যেটি সিনাই পর্বতে প্রবেশ করে তাতে লেখা ছিলোঃ ناصرنا ناصر... ناصرنا عبد الناصر ‘আমাদের সাহায্যকারী নাসের... আমাদের সাহায্যকারী আবদুন নাসের’। আর ইসরাইলের প্রথম ট্যাঙ্কবহরে তাওরাতের কিছু পঙক্তি লেখা ছিলো। মোশে দায়ান (Moshe Dayan)[১১] এর কন্যা Yael Dayan তাঁর Israel Journal : June 1962[১২] গ্রন্থে বলেন- এই মেয়ে ইসরাইলি সেনাবাহিনীতে সশস্ত্র সৈনিক ছিলেন-‘দক্ষিণ ফ্রন্টের খবর যখন আমাদের কাছে পৌঁছে, ভয়ে আমাদের কাঁধের মাংস কেঁপে ওঠে। সেখানে মিসরীয় বাহিনী আক্রমণ করেছে। এর কিছুক্ষণ পরেই হাখাম [র‍্যাবাই বা ইহুদি ধর্মগুরু] আমাদের কাছে আসেন এবং তাওরাত থেকে কিছু পঙক্তি পাঠ করে শোনান। তাওরাতের পাঠ শুনে আমাদের ভয় শান্তিতে এবং শঙ্কা স্বস্তিতে পরিণত হয়’। হ্যাঁ, ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্ত করে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রকে ধর্মগুরুরাই পরিচালনা করেন। ডেভিড বেন গুরিয়ন ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করছিলো। সে বিরাট ধর্মগুরু ছিলো না। গুরিয়ন তার মেয়েকে কে ইহুদি পাত্রের কাছে বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু হাখাম এই বিবাহ-বন্ধনে বাধ সাধে। সে বলে, আমাদের ইহুদি ধর্মানুসারে আপনার মেয়ে ইহুদি নয়। কারণ, তার মা ইহুদি নয়। ১৯৬৫ সালে চার্চিল মৃত্যুবরন করেন। তাঁর জানাযায় ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট ও প্রয়াধানমন্ত্রী অংশ গ্রহণ করে। চার্চিলের জানাযা হয়েছিলো শনিবারে। ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী সেদিন ছয় কিলোমিটার হেঁটেছিলো এবং গাড়িতে চড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। কারণ তাদের ধর্মে শনিবারে গাড়িতে চড়া নিষিদ্ধ।

যেদিন তারা মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে। মসজিদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত জর্ডান সেনাবাহিনীর পাঁচ সৈনিক কোনো লড়াই করে নি। প্রতিরোধ করে নি। মসজিদে প্রবেশের পর ডেভিড গুরিয়ন বেন বলে, ইসরাইলে প্রবেশের পর আজকের দিনটি আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ দিন। সে ঘোষণা করে-আমি তখন পশ্চিমতীরে ছিলাম এবং রেডিও শুনছিলাম- আমি ইসরাইলি সৈন্যদের রেডিওতে বলতে শুনলাম, মুহাম্মদ মারা গেছে। সে মারা গেছে আর কিছু অবলা রেখে

গেছে। এভাবে তারা বলতে থাকে। দায়া ঘোষণা করে, জেরুজালেম থেকে মদিনা পর্যন্ত আমাদের কর্তৃত্বের অধীনে থাকবে। আর এদিকে আবু খালেদ ২৭ শে মে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। বিশ্বের সাংবাদিকরা সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তার হাতে ছিলো সিগারেট । সে বলছিলো, আমরা ইহুদিদের সঙ্গে লড়াই করবো এবং যারা তাদের সহায়তা করে তাদের সঙ্গেও লড়াই করবো। আমরা আমেরিকার সঙ্গেও লড়াই করবো। এবং তার হাতে সিগারেট পুড়ছিলো।

কুরাইশের নেতারা উমাইর বিন ওয়াহিব আল-জাহিমকে মুসলমানদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য পাঠালো। তারা তাকে বললো, তুমি যাও এবং মুসলমানদের সংখ্যা নির্ণয় করে এসে আমাদেরকে বলো। সে একটি ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম বাহিনীর চারপাশে ঘুরে নিজেদের শিবিরে ফিরে এলো। কুরাইশ নেতারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, মুসলমানদের সংখ্যা কতো হবে? উমাইর বললো-

ثلاث منة يزيدون أو يقاون قليلا، لكن يا قريش رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يشرب البلايا تحمل المنايا

‘তাদের সংখ্যা হবে তিনশো। তবে তার চেয়ে সামান্য কমবেশিও হতে পারে। কিন্তু হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি বিপদকে মৃত্যু বহন করতে দেখেছি। ইয়াসরিবের উটগুলো ভয়াবহ বিপদ, সেগুলো মৃত্যু বহন করে নিয়ে এসেছে’।

البلايا-এর অর্থ কী? এটি البلياة শব্দের বহুবচন। البلية অর্থ হচ্ছে জাহেলি যুগের সেই উট বা চতুস্পদ জানোয়ার যাকে তার মালিকের মৃত্যুর পর কবরের পাশে বেঁধে রাখা হতো এবং খাওয়ার জন্যে কোনো ধরনের দানাপানি দেয়া হতো না। পশুটি শেষ পর্যন্ত না খেয়ে মারা পড়তো। [بلية-এর সাধারণ অর্থ বিপদ, পরীক্ষা, দুর্যোগ]। نواضح শব্দটি ناضح-এর বহুবচন। এর অর্থ এমন উট যা শস্যখেতে দেয়ার জন্য পানি বহন করে নিয়ে যায়। সে আরো বলে, ‘সেই উটগুলো ভয়ঙ্কর মৃত্যু বহন করে আছে। তরবারি ছাড়া আত্মরক্ষার জন্যে তাদের কাছে আর কোনো উপকরণ নেই। তাদের কেউ-ই অন্তত অন্য একজনের প্রাণ হরণ করা ব্যতীত নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবে না। তারা যদি তাদের সমসংখ্যক কুরাইশদের হত্যা করে তাহলে- আল্লাহর কসম-এরপর আমাদের জীবনে আর কোনো কল্যাণ থাকবে না’। তারা উমাইরকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী মনে করো? সে জবাব দিলো, আমি মনে করি বুদ্ধিমানেরা এই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে এবং আমরা মক্কায় ফিরে যাবো।

হাকিম বিন হিযাম বসেছিলো। হাকিম বিন হিযাম খুয়াইলিদ ছিলো হযরত খাদিজা রাঃ-এর ভাতিজা। খুয়াইলিদ খাদিজা রাঃ-এর পিতা এবং হিযাম খাদিজা রাঃ-এর ভাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তার ফুফা। তাই হাকিম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

ভালোবাসতো। সে কুরাইশ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে গেলো। কুরাইশের সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলো উতবা বিন রবিয়া। উতবা মুশরিকদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলো, মুসলমানদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলো। তাই হিজরতের আগে মক্কার মুশরিকরা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কোনো দাবি পেশ করতে চাইতো, তারা উতবাকে তাঁর কাছে পাঠাতো। উতবা ছিলো বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সম্মানিত ও চরিত্রবান। সে বাস্তবিকই ঈমান আনতে যাচ্ছিলো। হাকিম বিন হিযাম উতবা বিন রাবিয়াকে[১৩] বললো, 'হে উতবা... হে আবুল ওয়ালিদ, আপনি কুরাইশের প্রধান ব্যক্তি এবং তাদের নেতা। আপনি ইচ্ছে করলে এমন সুনাম অর্জন করতে পারেন, যা আপনাকে চিরস্মরনীয় করে রাখবে। আপনি দৃঢ়তার সঙ্গে আপনার জাতিকে এই অন্যায় যুদ্ধ থেকে বিরত রাখুন'। উতবা বললো, 'এজন্যে আমি প্রস্তুত আছি; কিন্তু আবু জাহ্‌ল আমার সঙ্গে একমত হয় কি-না সন্দেহ। তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো'।

মক্কার মুশরিকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে উতবা বিন রবিয়াকে তাঁর কাছে পাঠাতো। সে একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, 'ভাতিজা, শোনো, তুমি যদি সম্পদ চাও, আমরা তোমার জন্যে সম্পদ জমা করতে প্রস্তুত। তুমি যদি রাজত্ব চাও, আমরা তোমাকে রাজত্ব প্রদানেও প্রস্তুত। এবং তুমি যদি আরো কিছু চাও...। আর তোমার কাছে যদি জিনের মন্ত্রনা এসে থাকে, আমরা সম্পদ জমা করে তার চিকিৎসা করাতেও প্রস্তুত'। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আবু ওয়ালিদ, শুনুন'। -এই বলে সুরা হা-মীম আস-সাজদা থেকে তিলাওয়াত করলেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম-

حم. تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

'হা-মীম। এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ন। এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ-আরবি ভাষায় কুরআন-জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তা শুনবে না'। এভাবে তেলাওয়াত করে তিনি তেরোতম আয়াত فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ 'তবু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও সামুদের শাস্তির অনুরূপ'। -পর্যন্ত পৌঁছলে উতবা রাসুলের মুখে হাত রাখে এবং বলে, 'তুমি যে-পংক্তিমালা আবৃত্তি করেছো, তাই যথেষ্ঠ; আবৃত্তি পূর্নাঙ্গ করার দরকার নেই'। এই বলে উতবা উঠে গেলো। সে দেখলো আবু জাহ্‌ল এগিয়ে আসছে। আবু জাহ্‌ল তাকে দেখেই বললো, 'আবু ওয়ালিদ যে চেহারা নিয়ে মুহাম্মদের কাছে গিয়েছিলো, সে ভিন্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে। হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমার মত হচ্ছে, তোমরা এই লোকটিকে ত্যাগ করো। আল্লাহর কসম, আমি

তার মুখে নতুন কথা [কুরআনের আয়াত] শুনতে পাচ্ছি। আমি মনে করি, তোমরা তাকে ত্যাগ করো'। আবু জাহ্‌ল আশঙ্কা করলো, উতবা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে। উতবা যদি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে তাহলে কুরাইশ সম্প্রদায়ের অর্ধেক লোকই ইসলাম গ্রহণ করবে। আবু জাহ্‌ল উতবার কাছে গিয়ে বললো, 'হে আবু ওয়ালিদ?' উতবা বললো, 'হ্যাঁ'। আবু জাহ্‌ল বললো, 'তুমি তোমার জাতিকে ত্যাগ করছো, তারা তোমার জন্যে খাদ্য বা রুটি কেনার জন্যে অর্থ সম্পদ জমা করছে'। উতবা বললো, 'ছি ছি, আবু জাহ্‌ল, এগুলো কি আমার কোনো প্রয়োজন আছে?' আবু জাহ্‌ল বললো, 'তারা শুনেছে, তুমি টাকা-পয়সা দাবি করার জন্যে মুহাম্মদের কাছে গিয়েছো'। এসব কথা শুনে উতবা শপথ করলো, সে কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে কথা বলবে না।

আল্লাহর শত্রুদের চরিত্র এখন পর্যন্ত এমনই রয়ে গেছে। তারা যদি আপনার সঙ্গে লড়াই করতে চায়, একটা না একটা অজুহাত তারা বের করবে এবং আপনার সঙ্গে লড়াই শুরু করে দেবে। আপনি কোথায় কাজ করছেন? আপনি কি সৌদি আরবে কাজ করছেন? আপনি কি ওখানকার কোনো কর্মচারী? আপনি যেখানেই কাজ করেন আপনার পেছনে লোক লাগানো থাকবে এবং কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে আপনাকে ফাঁসানো হবে। আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন? আপনি কি কুয়েত থেকে এসেছেন? আপনি যদি কুয়েতে কাজ করে থাকেন তাহলে মুদির হেলালকে চেনার কথা। সে কর্মচারী; তার কাজ হচ্ছে রিপোর্ট তৈরি করে রাষ্ট্রের কাছে পেশ করা। আপনারা তাকে কখনো বিশ্বাস করবেন না। তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের পানির চেয়েও পবিত্র। সে আপনাদের চেয়ে একশো গুণ বেশি কাজ করে।সে একা যে কাজ করে আপনারা একহাজার জন তার অর্ধেক কাজ করেন না। তার এই কর্মক্ষমতা ও কর্মস্পৃহা বোধগম্য নয়। সে যতদিন রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করবে রাষ্ট্র তাকে ততোদিন রাখবে। মানুষ তার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে।

এখন আফগানিস্তানেও মৌলবি টাইপের কিছু লোক আছে, যারা তথ্য পাচার ও মানুষের মধ্যে ফেতনা বাঁধিয়ে অর্থ উপার্জন করে। আরবরা যদি তাদেরকে টাকা-পয়সা না দেয়, তারা স্থানীয় লোকজন ও আরবদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে ছাড়ে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে। এরা লোকজনের মধ্যে বলে বেড়ায়, ওরা হচ্ছে আরব। ওরা ওহাবি। ওরা তোমাদের হানাফি মাযহাবকে ধ্বংস করতে এখানে এসেছে। এভাবে তারা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে এবং মুসলমানদের মধ্যেই সম্পর্ক ছিন্ন করে। এটা হচ্ছে তাদের ফেতনা ছড়িয়ে দেয়ার সংক্ষিপ্ত পথ। আমি একবার শায়খ রব্বানি ও আরো প্রায় একশো বা দুইশো কমান্ডারের সামনে তাদের সম্পর্কে [তাদেরকে লক্ষ্য করেও বটে] কথা বলেছি। আমি বলেছি, 'এখানে কিছু লোক আছে যারা আমাদের ও আপনাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন

করতে চায়। এই জিহাদ ও বিশ্বজুড়ে তার সহায়তাকারিদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়। তারা বলে বেড়ায়, আরবরা ওহাবি। ওরা তোমাদের হানাফি মাযহাব ধ্বংস করার জন্যে এখানে এসেছে। কিন্তু তাদের কথা সত্য নয়। আমরা আপনাদের সেবা ও সহায়তা করার জন্যে আফগানিস্তানে এসেছি। আমরা আপনাদের মাযহাব ধ্বংস করতে এখানে আসি নি। ইসলামের চার মাযহাব সম্পর্কেই আপনারা ভালো জানেন। ইমাম আবু হানিফা রহঃ, ইমাম শাফি রহঃ, ইমাম মালেক রহঃ, ও ইমাম আহমদ রহঃ সম্পর্কেও আপনারা জানেন। আরব বিশ্বে ওহাবি মাযহাব বলে কোনো মাযহাব নেই। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ছিলেন একজন সংস্কারপন্থী ব্যক্তি; তিনি চিন্তা-চেতনা, আকিদা ও বিশ্বাস এবং ফিক্হ ও ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে সম্পূর্নভাবে আহমদ বিন হাম্বল রহঃ-এর অনুসারী ছিলেন'। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম। 'আপনার কি আহমদ বিন হাম্বল রহঃ-কে গ্রহণযোগ্য মনে করেন? তিনি কি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য?' তাঁরা সবাই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আহমদ বিন হাম্বল রহঃ আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য'। আমি তাঁদের বললাম, 'আমরা চাঁর মাযহাবকেই সম্মান করি। আমরা ইমাম আবু হানিফা রহঃ-কে সম্মান করি, ইমাম শাফি রহঃ-কে সম্মান করি, ইমাম মালেক রহঃ-কে সম্মান করি এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহঃ-কে সম্মান করি। আপনারা যদি আহমদ বিন হাম্বল রহঃ-কে সম্মান না করেন এবং তাঁকে গ্রহণযোগ্য মনে না করেন, তাহলে আপনারাই ওহাবি। আমরা ওহাবি নই। চার মাযহাবকে যে গ্রহণযোগ্য মনে করে না তাকেই তো তারা ওহাবি বলে, নয় কি?'

আমার ভাইয়েরা, ওহাবি মতবাদ সম্পর্কে যে-বইটি এখানে প্রচলিত, তা ইংরেজদের আমল থেকে চালু হয়ে আছে। ইংরেজদের আমল থেকেই এই বইটি আফগানিস্তানে বিতরণ করা হয়। এই বইয়ে মুদ্রিত আছে, ওহাবিরা সহোদর বোন ও মাকে বিবাহ করা বৈধ মনে করে। এই বইগুলো এখন আফগানিস্তানে পঠিত হয় এবং যারা পাঠ করে তারা সে-বিষয়ে কিছুই জানে না। তারা একেবারেই মূর্খ। ইংরেজরা উসমানি সাম্রাজ্যের ভেতরও এভাবে ফেতনা ছড়িয়ে দিয়েছিলো। যারা কম জানে বা সহজ সরল তারা ওহাবি মতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো। ওহাবি মতবাদের বিরুদ্ধে তিনশো বছরের এই যুদ্ধে মুসলমানদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।

আমার ভাইয়েরা, পবিত্র কাবা শরিফের ইমাম আবদুল্লাহ বিন সাবিল চার বছর আগে এখানে এসেছিলেন এবং ইমামতি করেছিলেন। তিনি যখন ইসলামাবাদ ও করাচিতে ছিলেন তখন লোকদের নামায পড়িয়েছেন। মুসল্লিদের অনুরোধেই তিনি নামায পড়িয়েছিলেন। শুজা আলি কাদেরি- ইসলামাবাদের একটি আদালতের উচ্চ পর্যায়ের বিচারক –ফতোয়া দেন, কেউ আবদুল্লাহ বিন সাবিলের পেছনে নামায পড়লে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে-ভালো, কিন্তু কেনো সে তালাক হয়ে যাবে? এ-ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কী? নামায বাতিল হয়ে যাবে, সেটা না-হয়

ঠিক আছে। কিন্তু স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, কী কারণে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, তার কী দোষ? এই ফতোয়া প্রদান এখনো অব্যাহত আছে। আমি নিজে আহমদ বেরলবির কিতাবে পড়েছি, কুকুরও ওহাবিদের চেয়ে ভালো। ইহুদি-খ্রিস্টানরাও ওহাবিদের চেয়ে কম অনিষ্টকর। এটা এখনো তাদের মাথায় রয়ে গেছে। তারা একেবারেই মূর্খ, কিছুই জানে না।

এ-ব্যাপারে আমার এই বক্তব্যের পর শায়খ রব্বানি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, আসুন, এই বিষয়টি আপনার কাছে ব্যাখ্যা করি। আমি বললাম, ঠিক আছে, তাহলে তো ভালোই হয়। তিনি বললেন, আমাদের এই জাতির অজ্ঞতা বিদিত; তারা কোনো জ্ঞান রাখে না, ওহাবি মতবাদ সম্পর্কেও তারা জানে না, অন্যদের সম্পর্কেও তারা জানে না। রব্বানি বলেন, পির গোত্রীয় এক লোক- আপনারা পির গোত্রীয় লোকদের চিনবেন, তারা মাথার চুল পাকিয়ে সামনের দিকে নিয়ে আসে এবং দাড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখে। আমি সম্ভবত তাদের সম্পর্কে আপনাকে বলেছি। তার পির গোত্রীয় এক লোক কাবুলে একটি লোক দোকান খোলে। তার পাশে এক ব্যবসায়ী থাকে, সে হলো মৌলবি গোত্রের, বুঝতে পারছেন? এসব মৌলবিকে কখনো কখনো আলেমও বলা হয়। এরা আল্লাহর দীনকে নিয়ে ব্যবসা করে। এই ব্যবসায়ী মৌলবি সেই পির গোত্রী লোক থেকে ঋণ নেয়। এক সময় ঋনের পরিমাণ অনেক হয়ে দাঁড়ায়। এক সময় দোকানের মালিক পির ব্যাটা মৌলবিকে ঋণ পরিশোধ করতে বলে। পির গোত্রীয় লোকটাও কাফের; সে ইমামদের সর্বসম্মতক্রমেই কাফের। পির ব্যাটা ঋণ পরিশোধ করতে বলায় মৌলবি ক্ষেপে যায়। সে বলে, আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই। দোকানের মালিক পির বলে, আজকে আমার ঋন পরিশোধ না করলে আর কখনো তোমাকে ঋন দেবো না। মৌলবি বলে, আমি বললাম তো, আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই। পির বলে, ঠিক আছে, তুমি যখন আমার ঋন পরিশোধ করবে না, আজকের পর থেকে আমি তোমাকে কখনো আর ঋণ দেব না। মৌলবি বলে, আমি আগেই বলেছি, আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই। তুমি কেনো জোরাজুরি করছ? আমি কীভাবে ঋণ পরিশোধ করবো? পির বলে, আমার কাছে তুমি কাউকে পাঠাবে না; টাকার জন্যেও না, সওদার জন্যেও না। মৌলবি বলে, ঠিক আছে, তোমার চিকিৎসা আমি করবো।

পরের শুক্রবার একটি ঘটনা ঘটে। মৌলবি জুমআর নামাযের পর ঘোষণা করে, লোকসকল, আপনারা শুনুন, আমি আপনাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিতে চাই। এই যে আপনাদের এখানে এক পির থাকে, দোকানের মালিক, সে ওহাবি মতাদর্শ গ্রহন করেছে এবং ওহাবি হয়ে গেছে। আপনারা কেউ তার কাছে যাবেন না। লোকেরা তার কথা শুনলো এবং পির ব্যাটার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। তারা কেউ তার দোকানে যায় না এবং সওদাও কেনে না। কেউ কেউ তার দোকানে গেলে সে জিজ্ঞেস করে, কেনো আপনারা আমাকে এড়িয়ে চলছেন? আপনারা তো

আমার দোকানে আসেন না। লোকেরা বলে, তুমি তো ওহাবি হয়ে গেছো। এই জন্যে আমরা তোমার কাছে আসি না। পির জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোত্থেকে শুনেছেন, আমি ওহাবি হয়ে গেছি? লোকেরা বলে, মৌলবি শুক্রবার মসজিদে ঘোষণা করেছে, তুমি ওহাবি হয়ে গেছো। পির বলে, ঠিক আছে, আমি দেখছি।সে পরে মৌলবির কাছে আসে। তাকে বলে, ভাই, আমার ঋণ আমি ছেড়ে দিলাম। তোমাকে কিছু দিতে হবে না। আর এই নাও, এটা হচ্ছে তমার জন্যে একটা ভালো উপহার। মৌলবি বলে, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি ভালো কাজ করেছো। আগামী শুক্রবার তোমার ব্যাপারে কথা হবে। পরের শুক্রবার জুমআর নামাযের পর মৌলবি ঘোষণা করে, ভাইসকল, শুনুন, আমি আপনাদের একটা বিরাট সুসংবাদ দিতে চাই। এই যে পির, সে আর ওহাবি নেই, সে আবার পির হয়েছে। আপনারা তার দোকানে যাবেন। এই ঘোষণার পর লোকেরা আবার পিরের দোকান থেকে সওদা কিনতে শুরু করে।

এখন আরবদের সঙ্গে লড়াই বাঁধাবার একটা ভালো কৌশল হলো তাদের বলা ঃঃ এরা ওহাবি। স্থানীয় লোকেরা শুরুতে খুবই অজ্ঞ ছিলো; যা শুনতো তাই বিশ্বাস করতো। ওহাবি মতাদর্শ কী, ওহাবি কারা- সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিলো না। তারা কিছুই জানতো না। কিন্তু আরবরা যখন তাদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে, স্থানীয় লোকেরা আরবদের দেখছে, তাদের সম্পর্কে জানছে- স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের ভালোবাসতে শুরু করেছে। তারা এখন আরবদের যথেষ্ট সম্মান করে এবং নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। এখন মার্কিন ও ফরাসিরা আফগানিস্তানের ভেতরে যখন আফগানদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তারা বলে, তোমাদের এখানে কি ওহাবি আছে? ওহাবি বলতে তারা আরবদের বোঝায়। কারণ আফগানিস্তানে আরবরাই মার্কিন ও ফরাসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তাদের মোকাবিলা করেছে।

বদর যুদ্ধের ঘটনায় ফিরে যাই। হাকিম বিন হিযাম উতবাকে বললো, আপনি কুরাইশদের প্রধান ও তাদের নেতা। কুরাইশে আপনার অনুগত লোকের সংখ্যা অনেক। শেষ পর্যন্ত যা কল্যাণকর হবে, তা তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে আপনার কি কোনো আগ্রহ নেই? উতবা জিজ্ঞেস করলো, হাকিম, সেই কাজটা কী? হাকিম বললো, আপনি লোকদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আর আপনার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ আমর বিন আল-হাযরামির বিষয়টিও আপনিই দেখুন। আবদুল্লাহ বিন যাহাশ রাঃ-এর একটি অভিযানের ফলে আমর বিন আল-হাযরামি নিহত হয়েছিলো। উতবা বললো, আমি তা করেছি। আমিই তার রক্তপণ দেবো। তুমি যা বলেছো, সে ছিলো আমার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ; সুতরাং তার রক্তপণ দেয়ায়র দায়িত্ব আমার। আর তার সম্পদের ব্যাপারটি মনে করো ইবনুল হানাযালিয়্যাই দেখা-শোনা করে। ইবনুল হানযালিয়্যা মানে আবু জাহ্‌ল। তার মায়ের নাম ছিলো হানযালিয়্যা। উতবা বলে, আমি আশঙ্কা করি, লোকদের আর কেউ নয়, আবু জাহ্‌লই

গণ্ডগোল বাঁধাবে। উতবা বিন রবিয়া ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে গেলো। সে কুরাইশ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললো, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের মোকাবিলা করে ভালো কিছু করতে পারবে না। তোমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করো, তবে যে-লোকেরা তার দিকে তাকাতে ঘৃণাবোধ করতো, তারাই তার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে। কারণ তারা তাদের চাচাত ভাই বা মামাত ভাই বা তাদের গোত্রের একজনকে হত্যা করেছে। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও আর গোটা আরব ও মুহাম্মদের মধ্যে রাস্তা খুলে দাও। তারা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করে তবে তাই তো তোমরা চেয়েছো। তোমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে। আর যদি অন্য কিছু ঘটে তবে সে তোমাদের দেখবে এবং তোমরা যা চাও তা তার থেকে আদায় করতে পারবে না'।

হাকিম বিন হিযাম আবু জাহ্লের কাছে যায় এবং উতবা বিন রবিয়ার বক্তব্যের বিষয়ে বলে। উতবার এমন বক্তব্যের কথা শুনেই আবু জাহ্ল বলে ওঠে, 'আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের দেখে উতবার ফুসফুস ফুলে উঠেছে। অসম্ভব, আমরা কিছুতেই ফিরে যাবো না। আল্লাহ আমাদের মধ্যে আর মুহাম্মদের মধ্যে ফয়সালা করার আগে আমরা মক্কায় ফিরে ফিরবো না'। সঙ্গে সঙ্গে সে আমর বিন আল-হাযরামির ভাই আমির বিন আল-গাযরামিকে ডেকে বললো, 'তুমি যাও, তুমি গিয়ে তোমার ভাইয়ের প্রতিশোধ দাবি করো। তুমি তোমার ভাইয়ের মৃত্যু ও মৈত্রীচুক্তির কথা ঘোষণা করো'। এই কথা শোনামাত্রই আমির বিন আল-হাযরামি উঠে গেলো এবং আর্তনাদ করে বলতে লাগলো, হায়, আমার ভাই আমর! হায়, আমার ভাই আমর! তার এই আর্তনাদ শুনে লোকদের ভেতর ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। তারা উতবার বিরোধিতা শুরু করে। উতবা বিন রবিয়ার সব পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়। কুরাইশের যোদ্ধা বাহিনী কঠিন হয়ে ওথে। তারপর কী ঘটে? আগামিকাল ইনশাআল্লাহ নবুওয়তের পবিত্র দস্তরখানে আমরা মিলিত হবো। এই আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহপাক অবশ্যই আমাদের উপকৃত করবেন। তিনি আমাদের খুবই নিকটে আছেন; তিনি সবকিছু শোনেন এবং সাড়া দেন। আপনাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

---

১০) তাফসির ফি যিলালিল কুরআন, সুরা আনফাল, শহীদ সাইয়িদ কুতুব রাঃ।

১১) موشي دايان (জন্ম ১৯১৫, মৃত্যু ১৯৮১) ঃ ইসরাইলি রাজনীতিবিদ ও সামরিক কর্মকর্তা। ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে ইসরাইলি বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন। মিসর, সিরিয়া ও জর্ডানের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৭ সালে ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ইসরাইল ও আরবের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেন না মনে করে ১৯৭৯ সালে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত কৃষিমন্ত্রী এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন দখল যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১২) Israel journal; June 1967 (also known as A Soldier's Diary)- 1967

১৩) উতবা বিন রবিয়া বদর যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর সেনাপতি ছিলো।

[পর্ব ৮]

বদর যুদ্ধঃ তিন

আমরা বদর যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এই যুদ্ধই মানবেতিহাসের দিকচিহ্নকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। বাস্তবিকই মুসলমানরা যদি সেদিন পরাজিত হতো, পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম শেষ হয়ে যেতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই দোয়া করেছেন-

اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض

'হে আল্লাহ, তুমি যদি এই দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তবে জমিনে কিছুতেই তোমার ইবাদত হবে না'।

বুদ্ধিমানের পরামর্শ

আমরা বলেছিলাম, হাকিম বিন হিযামের পরামর্শ শোনার পর উতবা বিন রবিয়া ফাটল মেরামত করার চেষ্টা করেছিলো এবং লোকদের নিয়ে মক্কায় ফিরে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি যে নষ্ট করে দেয় সে হচ্ছে আবু জাহ্‌ল। সে আমির বিন আল-হাযরামিকে উসকে দেয় এবং সে তার ভাই আমর বিন আল-হাযরামির হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে আর্তনাদ করতে থাকে। বদর যুদ্ধের দেড় মাস আগে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রাঃ-এর নেতৃত্বে একটি দল আমর বিন আল-হাযরামিকে হত্যা করে। আমরা বলেছিলাম, উতবা বিন রবিয়া একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। কিন্তু বিপর্যয়ক পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমানের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। এ-ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে একজন বক্রচিন্তার লোক অনেক বুদ্ধিমানের উপদেশ-পরামর্শ বিনষ্ট করে দেয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন- إن كان فيهم خير ففي صاحب الجمل الأحمر 'তাদের মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকে তবে তা আছে লাল উটের মালিকের মধ্যে'। লাল উটের মালিক বলতে তিনি উতবা বিন আমরকে বুঝিয়েছেন। যখন আমির

বিন আল-হাযরামি ‘হায়, আমার ভাই আমর! হায়, আমার ভাই আমর!’ বলে আর্তনাদ করতে থাকে, তার এই আর্তনাদের নিচে উতবা বিন রবিয়া, হাকিম বিন হিযাম ও অন্যদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে। তারা লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আরিশে দোয়া করলেন। দোয়ার পর বললেন, إذا اكتنفوكم فاكثبوهم بالنبل ‘তারা যখন তোমাদের কাছাকাছি আসবে, তোমরা তাদের দিকে তীর ছুঁড়ে আঘাত হানবে’। যুবকেরা খুব উত্তেজিত ছিলো। সব মানুষই উত্তেজিত ছিলো। এই প্রথম কাফেররা মুসলমানদের মুখোমুখি হচ্ছে।

আবু জাহ্‌ল তখন যুদ্ধের ময়দানে। তার চারপাছে কাফের যোদ্ধাদের দেয়াল। তারা তাকে বেষ্টনি দিয়ে আছে। যেনো ঘন বৃক্ষরাশি একটি মাত্র কাঠামোকে চারদিক থেকে আড়াল করে আছে। তারা চিৎকার করে বলছে কেউ আবুল হাকামের[১৪] কাছাকাছি ঘেঁষতে পারবে না। কিন্তু আবদুর রহমান বিন আওফ বলেন, বদর প্রান্তরে আমি যুদ্ধে রত আছি, এমন সময় আমার দুই পাশে দুই আনসার তরুণকে দেখতে পেলাম। আশা করেছিলাম, আমি তাদের একজন বা তাদের উভয়জন থেকে অধিক শক্তিশালী। তাদের প্রথমজন আমাকে বললো, “চাচা, আবু জাহ্‌ল কোথায় আছে? আমি বললাম, তাকে দিয়ে তোমার কী দরকার? তরুণটি বললো, আমি শুনেছি সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি-গালাজ করে। আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, যদি আমি তাকে দেখতে পাই, আমার ছায়া তার ছায়া মাড়ানোর আগেই আমাদের একজনের মৃত্যু ঘটবে”’। [তাকে যেখানেই দেখবো সেখানেই হত্যা করবো নতুবা তার সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দেবো।]

তার বয়স কতো হবে তখন? এই সতেরো বশর। হুযায়ফা রাঃ থেকেও ছোটো হবে। দ্বিতীয় তরুণটিও আবদুর রহমান বিন আওফের কাছে একই কথা জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, ‘কিচ্ছুক্ষণ পর আমি আবু জাহ্‌লকে দেখতে পেলাম। আমি তাদেরকে বললাম, ওই যে আবু জাহ্‌ল। তারা বাজপাখির মতো তার ওপর উড়ে পড়লো’। তাঁরা ছিলেন পুরুষ, তরুণ। তাঁরা মৃত্যুকে গ্রহণ করার জন্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের গন্তব্য ছিলো জান্নাত। হযরত মুআয রাঃ বলেন, -এটা বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা- তাঁরা হলেন মুআয বিন আমর বিন আল-জামুহ, মুআয বিন আফরা। অপর বর্ণনা, সিরাতে বিন হিশামের আছে, তাঁরা হলেন, আফরার দুই পুত্র মুআয ও মুআউয়ায। মুআয রাঃ বলেন, ‘আমি তাকে দেখতে পেয়েই তার পায়ে আঘাত করি এবং তার টাখনুর অর্ধাংশ উড়ে যায়’। খেজুরের বিচির ওপর হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে যেমন হাতুড়ির নিচ থেকে বিচির অর্ধাংশ বেরিয়ে যায় তেমনি তরবারির নিচ থেকে আবু জাহ্‌লের টাখনুর অর্ধাংশ বেরিয়ে গেলো। যেনো তা বিনষ্ট খেজুরের বিচি। মুআয রাঃ বলেন, ‘আবু জাহ্‌লের পেছনে ছিলো তার ছেলে ইকরামা। সে আমার হাতে আঘাত করে। তার আঘাতে আমার বাহু ছিন্ন হয়ে গেলেও চামড়ার সঙ্গে ঝুলতে থাকে। ছিন্ন বাহুটি চামড়ার সঙ্গে ঝুলছিলো আর আমি এভাবেই

যুদ্ধ করছিলাম। কাটা স্থান থেকে রক্ত ঝরছিলো। অবশেষে আমি বললাম, এই হাত তো আমাকে ক্লান্ত করে ছেড়েছে। তারপর ছিন্ন বাহুটি পায়ের নিচে চেপে ধরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম'।

আমরা কেমন পুরুষ? আমাদের কারো পায়ে যদি একটি কাঁটা বেঁধে, সারাদিন এটা তাকে কাতর করে রাখে। তাঁরাও পুরুষ ছিলেন! কর্তিত বাশু, চামরার সঙ্গে ঝুলন্ত। সেই ঝুলন্ত বাহু নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা তরবারির আঘাতে আবু জাহ্লকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললেন। সে ভুলণ্ঠিত হয়ে পড়ে রইলো কিন্তুই মরলো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, من يتفقد لنا جهل بين القتلى 'কে মৃতদের মধ্য থেকে আবু জাহ্লকে খুঁজে আনতে পারবে?' আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ বলেন, 'আমি বের হলাম এবং মৃতদের মধ্যে আবু জাহ্লকে খুঁজতে লাগলাম। এক সময় তাকে পেয়ে গেলাম। সে তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসগুলো নিচ্ছিলো'। তিনি বলেন, 'আমি তার বুকের ওপর বসলাম। তাকে বললাম, "হে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন'। সে আমাকে বললো, 'তুই কি মক্কায় আমাদের তুচ্ছ রাখাল ছিলি না?' আমি বললাম, "হ্যাঁ, ছিলাম, হে আল্লাহর দুশমন"' আবু জাহ্ল শুধু রাখাল (راعي) বলে নি, বলেছে তুচ্ছ রাখাল (رويعي)। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ বলেন, 'সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, "আজ কার বিজয় হয়েছে?"' চিন্তা করুন, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস গ্রহনের সময়েও সে জিজ্ঞেস করেছে, কে বিজয়ী? তিনি বলেন, 'আমি বললাম, "বিজয় হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের"'। তিনি বলেন, 'এরপর আমি তার মাথা ধরে ঝাঁকি দিই। তাকে আমি বহন করে নিয়ে আসি এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে রাখি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে বলেন-

الله الذي لا إله غيره , إن لكل أمة فرعون وهذا فرعون هذه الأمة. "আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই,- এটা ছিলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কসম; অর্থাৎ সে আল্লাহ কসম, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। প্রত্যেক উম্মতের একটি ফেরাউন আছে। এ হলো এই উম্মতের ফেরাউন"'।

একটি বর্ণনায় আছেঃ আমার মনে হয় না বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থে বর্ণনাটি আছে এবং কাহিনিকারেরাও বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোকপাত করেন নি। -মক্কায় আবু জাহ্ল একবার আবদুল্লাহ বিন আমসউদ রাঃ-কে শাস্তি দিয়েছিলো। সে তাঁকে ধরে বেঁধে রেখেছিলো এবং কঠিন যন্ত্রণা দিয়েছিলো। বিন মাসউদ রাঃ চিকন-চাকন ও দুর্বল ছিলেন। মানে তার ওজন আমার ধারণা পয়ঁত্রিশ কেজির বেশি ছিলো না। সিরাতের গ্রন্থে আমরা এমনই তথ্য পেয়েছি। যাই হোক, আবু জাহ্ল বিন মাসউদকে বেঁধে রাখে এবং কানে-মাথায় আঘাত করে তাকে শাস্তি দেয়। বদর যুদ্ধে বিন মাসউদ রাঃ আবু জাহ্লের মাথা বহন করতে পারছিলেন না। তার মাথা ছিলো বড়ো। উতবা বিন রাবিয়ার মাথাও বড়ো ছিলো। সে তার মাথায় পরার জন্যে একটি শিরস্ত্রাণ খোঁজাখুজি করে;

কিন্তু তার মাথার মাপের কোনো শিরস্ত্রাণ পায় নি। উতবা ছিলো ضخم الجثة والهامة/ বিশাল দেহী ও বড়ো মাথার অধিকারী। ضخامة الهامة বা মাথা বড়ো হওয়া আরবে পৌরুষের নিদর্শন ছিলো। কারো প্রশংসা করা হলে বা কারো সদগুণ বর্ণনা করা হলে বলা হতো فلان ضخم الهامة/ অমুকের বিশাল মাথা। তারা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসা করতো, বলতো, তিনি বিশাল মাথার অধিকারী।

আবু জাহ্লও ছিলো বিশাল মাথার অধিকারী। তাই আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ যখন তার মৃতদেহ বহন করতে যান-আমার মনে হয় না এই বর্ণনাটির কোনো ভিত্তি আছে- বহন করতে পারেন নি। তাই কানের ভেতর ছিদ্র করে বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে দেখলেন, বললেন – أذن بأذن والرأس زيادة ‘কানের বদলে কান আর মাথাটা বাড়তি’। কিন্তু কোনো সিরাত গ্রন্থে এই ঘটনা আমি পাই নি এবং কোনো হাদিসের কিতাবেও পাই নি।

---

১৪) আবু জাহ্লের নাম ছিলো আবুল হাকাম (জ্ঞানের পিতা); রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরোধিতার কারণে তার নাম হয় আবু জাহ্ল (মূর্খতার পিতা)

[পর্ব ৯]

যুবক শ্রেণী

রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধের সময় যুবক শ্রেণীর ওপরই নির্ভর করে। বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন গেরিলা অভিযানের জন্যে আঠারো থেকে বিশ বছর বয়সী তরুণদের বেছে নিয়েছিলো। যেসব অভিযান আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা ও চরম সাহসিকতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হয় সেসব অভিযানের জন্যেই এমন তরুণদের বেছে নেয়া হয়। এই বয়সের তরুণেরা মৃত্যুকে কিছু মনে করে না, গণনার মধ্যেই আনে না তারা মৃত্যুকে; মৃত্যু তাদের কাছে তুচ্ছ। বিশেষ করে যখন তাদের আকিদা ও বিশ্বাসের ওপর দীক্ষিত করে তোলা হয়। বয়স্করা এ-ব্যাপারে অনেক বিবেচনা করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

يَشِيبُ ابْن آدَمَ وَيَبقَى مَعَهُ خَصْلَتَانِ الْحِرْصُ وَ طول الْأَمَلُ

‘আদম সন্তান বয়স্ক হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি খাসলতেরও বয়স বাড়তে থাকে- লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা’। [১৫] এটা সহিহ্ হাদিস।

১৯৬৯-৭০ সালের দিকে আমরা গেরিলা অভিযানে ছিলাম। ফাতাহ কিছু যুবককে প্রশিক্ষণের জন্যে চীন ও আলজেরিয়া পাঠিয়েছিলো। আমরা ভিন্ন কয়েকটি ঘাঁটিতে ছিলাম। এসব ঘাঁটিতে তারাই ছিলো যারা নিজেদের স্বেচ্ছায় এই কাজে সম্পৃক্ত করেছিলো। তারা আমাদেরকে শায়খ বলতো এবং আমাদের ঘাঁটিগুলো শায়খদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিলো। শায়খদের অনেকেই তাদেরকে উপদেশ দিতোঃ ‘বুদ্ধিমানেরা কখনো দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অভিযানে অংশগ্রহণ করে না’। কারণ যারা চতুর তারা আপনার অভিযান ব্যর্থ করে দিতে পারে। তারা অনেক অনেক বিষয় বিবেচনা করে। আপনাকে বলতে পারে, এখানে মাইন আছে, ওখানে ট্যাঙ্ক আছে, সেখানে বিপদ আছে। এসব বলে প্রথম দিন আপনাকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে এবং দ্বিতীয় দিন আপনার সব অভিযান ব্যর্থ হবে। তাই দুঃসাহসিকতাপূর্ণ গেরিলা অভিযানের জন্যে এমন যুবকদের বেছে নিতে হয় যারা মৃত্যুকে তুচ্ছ মনে করে এবং অত বেশি চিন্তা-ভাবনা করে না। তারাই এসব অভিযান পরিচালনা করতে পারে।

বাস্তবতা হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যুবক শ্রেণির মাধ্যমেই বিজয় লাভ করেছিলেন। সাহাবিদের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। যুদ্ধে অংশগ্রহণ-করা তিন-চতুর্থাংশের বেশি সাহাবির বয়স ছিলো বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। এই বয়স আত্মত্যাগের বয়স, আত্মোৎসর্গের বয়স, ঝুঁকি গ্রহণ করার বয়স। এই বয়সের যুবা-তরুনেরা নিজের ভবিষ্যতের জন্য কিছু ভাবে না। তাদের স্বপ্ন শূন্যতাকে ছাড়িয়ে যায়। তাদের স্বপ্ন কালপুরুষ নক্ষত্রকে স্পর্শ করে। তাদের ভেতর সবকিছু বাস্তব করার স্পর্ধা জেগে থাকে। তারা কোনোকিছুকেই পরোয়া করে না। মৃত্যুকে তারা ভয় করে না।

যাই হোক। আবু জাহ্লকে হত্যার পর দুই তরুণের প্রত্যেকেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমিই আবু জাহ্লকে হত্যা করেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের তরবারি আমাকে দেখাও। তাঁরা তরবারি দেখালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমিই আবু জাহ্লকে হত্যা করেছো।

মুআয বিন আমর বিন আল-জামুহকে তিনি এই কথা বললেন। তাঁরা ছিলেন তিন ভাইঃ মুআয বিন আফরা, মুয়াওয়ায বিন আফরা এবং আউফ বিন আফরা।

১৫) সহিহুল বুখারি, হাদিস ৬৫২৪; সহিহুল মুসলিম, হাদিস ২৯৬০; সুনানুত তিরমিযি, হাদিস ২৩৭৯; সুনানুন নাসায়িল কুবরা, হাদিস ২০৬৪।

[পর্ব ১০]

মুসলিম সৈনিকের শত্রুর সারিতে ঢুকে পড়া

আউফ বিন আফরা জিজ্ঞেস করলেন-

يَ رسُول اللهِ مَا يَضْحَكُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ؟

'ইয়া রাসুলুল্লাহ, বান্দার কোন কাজে তার প্রতিপালক হাসেন?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

غَمْسُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوِّ حَاسِرًا

'শত্রুর সারিতে তার বর্মহীন হাত ঢুকিয়ে দেয়া'। এই কথা শুনেই তিনি তাঁর গায়ের বর্ম খুলে ফেললেন এবং ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর তরবারি হাতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পরলেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন।[১৬] আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার জন্যে হাসেন, তিনি তাঁকে কখনো শাস্তি দেন না। শত্রুর সারিতে-যদিও তারা কয়েক হাজার হয়-মুসলিম সৈনিকের একাকী ঢুকে পড়া শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। তার যদি নিশ্চিত বিশ্বাসও থাকে যে সে নিহত হবে তবুও সে তা করতে পারবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের অবসন্নতা লক্ষ্য করলেন, দুইটি বর্ম পরিধান করে বেরিয়ে এলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে চলে

গিয়েছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল চাঙ্গা করতে চেয়েছিলেন। তিনি শত্রুর সারিতে বর্মহীন হাত ঢুকিয়ে দেয়ার কথা বলেছিলেন। কারণ, একাকী দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অভিযানও সমস্ত সৈনিকের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা করে তুলতে পারে। মনোবল যখন ভেঙ্গে পড়ে বা দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা অভিযানের শুরুতেই আত্মোৎসর্গমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অন্যদের আত্মবিশ্বাস ও যুদ্ধ-স্পৃহা জাগিয়ে তোলার জন্যে এমন অভিযানের বিকল্প নেই।

যদি শত শত শত্রু থাকে বা শত্রুর কয়েকটি সারি থাকে, তাহলে তাদের হাতে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কি কোনো মুসলমানের পক্ষে একাকী তাদের ভেতর ঢুকে পড়া বৈধ?- এ-ব্যাপারে আলেমদের ফতোয়া রয়েছে। তাঁরা বলেছেন, যখন জানবে যে সে শহীদ হবে, শত্রুদেরকে চরমভাবে ক্ষতবিক্ষত করবে বা মুসলমানদের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করবে, সে তাদের আত্মবিশ্বাস ও সংকল্প দৃঢ় করে তুলবে- এতে কোনো সমস্যা নেই। বরং তারা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

‘মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তার আত্মা বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র’। [সুরা বাকারাঃ আয়াত ২০৭]

বরং শাইখুল ইসলাম বিন তাইমিয়া বলেছেন, ‘এমন অভিযানের ব্যাপারে হাদিসেও প্রমাণ বিদ্যমান। হাদিসে সেই বালকের কথা এসেছে, যে বাদশাহকে বলেছিলো, “সমস্ত মানুষকে একত্র না করে আপনি আমাকে কিছুতেই হত্যা করবেন না। এবং আমাকে হত্যা করার সময় বলবেন, এই বালকের প্রতিপালকের নামে আমি এই বালককে হত্যা করলাম”। বালক বাদশাহকে যেভাবে বলেছিলো, বাদশাহ তাকে সেভাবেই হত্যা করলো। বালক দীনের কল্যাণের জন্যে আপন প্রাণকে উৎসর্গ করেছে। মানুষ যখন দেখলো বাদশাহ বালকটিকে এভাবে হত্যা করেছে, তারা বলে উঠলো, আমরা এই বালকের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এদের সম্পর্কেই কুরআনে বলা হয়েছেঃ ‘মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তার আত্মা বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র’।

এই ধরণের অভিযানকে কোনো অবস্থাতেই নিন্দাসূচকভবে আত্মঘাতী বা আত্মহত্যা বলা যাবে না। যদি কাফেরদের দল বিষাল হয় এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের শত্রুতা চরম হয় এবং তারা ইসলাম ধর্মের বিনাষ ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয় আর আপনি আপনার বুকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাদের

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং জীবন বিসর্জন দেন, তাহলে আপনি সেই ব্যক্তি, কুরআন শরিফে যার সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ ‘মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তার আত্মা বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র’। এটা কখনই আত্মহত্যা হিসেবে বিবেচিত হবে না। বরং এটা-আল্লাহ চান তো- শাহাদাতের সর্বোচ্চ পর্যায়।

ব্যভিচারের অপরাধে গামেদিয়ায় গায়ে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো। খালেদ বিন ওয়ালেদ রাঃ-এর গায়ে রক্তের ছিটা এসে পড়লে তিনি বিদ্রূপাত্মক কথা বলেছিলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, ‘থামো হে খালেদ! সে যে-তওবা করেছে তা সকল মদিয়ানবাসী বা পঞ্চাশজন মদিয়ানবাসীর মধ্যে বণ্টন করে দিলে তা তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। সে যেভাবে আল্লাহর জন্যে তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে-তার চেয়ে কি তারা বেশি হবে না-কি তারা শ্রেষ্ঠ?’[১৭] এই নারী নিজেকে আল্লাহর জন্যে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি একবার, দুইবার, তিনবার এবং বার বার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসেছিলেন নিজেকে পবিত্র করার জন্যে। রাসুল তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি আবারও আসছিলেন। তিনি বারবার বলছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে পবিত্র করুন। এভাবে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

ষাটের দশকের শেষের দিকে ভারত পাকিস্তানে হামলা করেছিলো। তারা লাহোরে প্রবেশ করে তা দখলে নিয়ে নিতে চেয়েছিলো। সাতশোটি ভারতীয় ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছিলো। ট্যাঙ্কগুলো ধ্বংস করার জন্যে সাতশো পাকিস্তানি যুবক নিজেদের প্রস্তুত করে। তারা বুকে বেল্টের সাহায্যে বিস্ফোরক বেঁধে নেয় এবং ট্যাঙ্ক এলেই তার নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে তারা সাতশো ট্যাঙ্কই ধ্বংস করে ফেলে। ফলে গোটা ভারতীয় বাহিনী পরাজিত হয়। মাত্র সাতশো যুবক একটি ব্যাপক যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

আমার ভাইয়েরা, এখন আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে প্রতিটি ফ্রন্টে মাত্র পঞ্চাশজন আত্মোৎসর্গকারী যুবক হলেই যথেষ্ট। তারাই রাশিয়ার ভয়াবহ আগ্রাসী শক্তিকে পরাজিত করতে পারবে। তাদের পঁচিশজন আর বি জি বহন করবে আর বাকি পঁচিশজন তাদের সাপোর্ট দেয়ার জন্যে কালাশনিকভ বহন করবে। এভাবে প্রস্তুতি নিয়ে তারা রাশিয়ার ট্যাঙ্কবহরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের প্রত্যেকে যদি একটিমাত্রও ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে, পঁচিশটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হবে। এতে গোটা ব্যাটালিয়ন পরাজিত হবে। মুষ্টিমেয় যুবকের আত্মোৎসর্গের ফলে অধিকাংশ যুদ্ধফ্রন্টের পরিস্থিতি পালটে গেছে এবং মুসলমানেরা বিজয় লাভ করেছে।

জাজি যুদ্ধক্ষেত্রের কথা বলি। আপনারা নিশ্চয় জাজি চেনেন। তার পাশে বিরোজাও আপনারা চেনেন। ওখানে সুড়ঙ্গপথ আছে। বিরোজা মানে ফিরোজা-বিরোজা নামে ডাকা হয়। ওখানে কাঠের যে-কারখানাটি আছে, রাশিয়ার ট্যাঙ্কবহর একবার সেখানে পৌঁছে যায়। আপনি বিরোজাতে গিয়ে ডানদিকে যদি একটু ঘোরেন, কাঠের কারখানাটি দেখতে পাবেন। এই কারখানাটি এখন বিধ্বস্ত। রাশিয়ার ট্যাঙ্কবহর ওখানে চলে আসে এবং জাজিতে ঢোকার উপক্রম করে। এই পরিস্থিতিতে মুজাহিদদের একজন সেনা-উপদেষ্টা ওখানে আসেন। তিনি মুহাম্মদ সিদ্দিক চেকরিকে বলেন, 'আপনি গুদাম জ্বালিয়ে দিন এবং পালিয়ে যান। এতে যদি আপনার পাপ হয় বা অন্যকোনো সমস্যা হয়, তার দায়-দায়িত্ব আমার'। মুহাম্মদ সিদ্দিক চেকরি বলেন, 'আল্লাহর কসম, ট্যাঙ্ক যদি আমার মাথাও গুঁড়িয়ে দেয়, আমি একচুলও নড়বো না'। এরপর তিনি যুবকদের আহ্বান জানানঃ হে যুবকেরা, কে আছো মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত, বেরিয়ে আসো। তিনি গুদামের দরজা খুলে দেন এবং যুবকদের মনোবল দৃঢ় রাখার জন্যে জোর দেন। কিছু যুবক গুদাম থেকে বেরিয়ে আসে। আল্লাহর কসম, এরাই যুদ্ধের পরিবেশ পাল্টে দেয় এবং রুশ বাহিনী পরাজিত হয়। মাত্র একজন যুবক-মুহাম্মদ সিদ্দিক চেকরি-কত বয়স হবে তাঁর? এই তো ছাব্বিশ কি সাতাশ। তাঁর দৃঢ় মনোবলের কারণেই ঐ ফ্রন্টে রুশ বাহিনী পরাজয় বরণ করে আর মুসলমানেরা বিজয়ী হয়।

তিনি যখন কাবুলে ছিলেন, অধিকাংশ রাতই নির্ঘুম কাটতেন। ঘুমের স্বাদ পেতেন না বললেই চলে। তিনি কাবুলের রাত্রিকালীন শাসক হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি চেকরি থেকে এসেছিলেন। আর বাবরাক কারমাল এসেছিলো কেমরি থেকে। চেকরি ও কেমরির মধ্যস্থলে একটি ছোটো নদী আছে। এই নদীর তীরবর্তী এলাকায় যেসব উদ্যান ছিলো, মুহাম্মদ সিদ্দিক বাবরাক কারমালকে[১৮] সেসব উদ্যানের একটি ফলও আহরণ করতে দেন নি। তিনি কারমালের বাগানগুলোতে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মন্ত্রীরা তাঁর কাছে চিঠি পাঠানঃ হে মুহাম্মদ সিদ্দিক, আপনি কারমালের বাগানগুলোতে বাদশা গাজির জন্যে যে-প্রতিবন্ধক তৈরি করেছেন তা তুলে নিন। আপনি যা চান আমরা আপনাকে তাই দেবো'। মুহাম্মদ সিদ্দিক মন্ত্রীদের কাছে চিঠি পাঠানঃ 'আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন। আপনারা যা চান আমি আপনাদের তাই দেবো'।

তাঁর সঙ্গে শেষ লড়াইয়ে রুশ বাহিনীর ১৫১টি জঙ্গি বিমান অংশ নিয়েছিলো। তাদের ট্যাঙ্কের সংখ্যা যে কত ছিলো তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তারা মুহাম্মদ সিদ্দিক চেকরির ঘাঁটি খুঁজতে থাকে। একসময় তারা তাঁর ঘাঁটির সন্ধান পায় এবং তিনি যে-কেন্দ্রে থাকতেন তাতে রুশ সেনারা প্রবেশ করে। কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। তিনি আরেকটি ঘাঁটির সন্ধানে গিয়েছিলেন। নিজের ঘাঁটিতে ফেরার সময় তিনি রুশ বাহিনীর সামনে পরেন। তাঁর ও রুশ সেনাদের মধ্যে দুরত্ব মাত্র

একশো মিটার। দিনের বেলা তখন আকাশে ঝকঝকে রোদ ছিলো। কোনো পাথর বা টিলা বা পাহাড় ছিলো না মুহাম্মদ সিদ্দিক যার আড়ালে চলে যেতে পারেন। রুশ সেনারা তাঁকে লক্ষ্ করে আশি থেকে একশোটি গুলি ছোঁড়ে। তিনি আশঙ্কা করলেন যে রুশ সেনাদের হাতে ধরা পড়ে যাবেন। তিনি তাঁর ঘাটির সদস্যদের আহ্বান জানানঃ ‘হে আমার দল, আমি তোমাদের কমান্ডার মুহাম্মদ সিদ্দিক চেকরি। আমি শত্রুদের কবলে পড়েছি। তারা আমাকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করে যাচ্ছে’। রুশ সেনারা তাঁকে সাড়ে তিন ঘন্টারও বেশি সময় গুলি ছোঁড়ে। তাঁর গায়ের পোশাক জ্বলে যায় এবং প্রায় তিরিশটি গুলি তাঁর কাপড় ভেদ করে। কিন্তু একটি গুলিও তাঁর শরীরে বেঁধে নি। এবং তিনি সামান্যও আহত হন নি।

হ্যাঁ, আমি যা বলছিলাম, বাস্তব হলো যুদ্ধজয়ের জন্যে তরুণ-যুবাশ্রেণি বিকল্পহীনভাবে অপরিহার্য। বিশেষ করে যাদের জীবন আকিদা ও বিশ্বাসের ওপর গড়ে উঠেছে। মৃত্যুকে যারা পরোয়া করে না; মৃত্যুকে ভালোবেসে যারা বেড়ে উঠেছে। যুদ্ধে জয়ের জন্যে যুবকশ্রেণীই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। তিনি বলেছিলেন, ‘হে মক্কার সম্প্রদায়, তোমরা কি তোমাদের সঙ্গীদের কারণে আমাকে দোষারোপ করছো?’[১৯] রাসুলের সাহাবিদের প্রায় সবাই তো যুবক ছিলেন। আল্লাহর কসম তাঁরা তাঁদের যৌবনেই পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। আপনাদের মত যুবকেরা যখন ইসলামের ওপর দীক্ষিত হবে, খোদাভীতি অর্জন করবে, অন্যায়, পাপাচার ও নিষিদ্ধ কার্যাবলি থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা মেনে চলবে- আল্লাহু আকবার- তাঁরা হবে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মুসলমান। আল্লাহর কসম, এই দুনিয়ার সবকিছু থেকে এই বিষয়গুলো আমার কাছে প্রিয়। যে-যুবকেরা আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলে, আল্লাহকে ভয় করে, তাকওয়া অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে সবার চেয়ে প্রিয়।

فدت نفسي وما ملكت يميني

فوارس صدقت فيهم ظنوني

فوارس لا يهابون المنايا

إذا دارت رحى الحرب الزبون

‘আমি তাদের জন্যে উৎসর্গ করেছি আমার প্রাণ এবং যা-কিছু আছে আমার মালিকানায়।/ তারা বীরসেনানী-আমার বিশ্বাস বাস্তব করেছে।/ বীরসেনানী তারা-ভয় করে না মৃত্যু;/ যখন সংঘটিত হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ’।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে বনু হাশেম ও অন্যরা বাধ্য হয়ে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তাই তিনি বললেন, 'তোমরা বনু হাশেমের অনেক মানুষকে পাবে যারা বাধ্য হয়েই এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। যুদ্ধের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা তাদের কাউকে সামনে পেলে হত্যা করবে না। কেউ যদি আবুল বুখতুরি বিন হিশামকে-ইনি কাবা শরিফে বয়কটের যে-দলিলপত্র ছিলো ছিঁড়ে ফেলেছিলেন-পায় তাকে হত্যা করবে না। তোমাদের কেউ আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকেও সামনে পেলে হত্যা করবে না। কারণ তারা বাধ্য হয়ে বদরে এসেছে'। রাসুলের এই কথা শুনে মুমিনদের একজন আবু হুযাইফা বিন উতবা বিন রবিয়া বললেন, 'আমরা আমাদের পিতা ও পিতৃব্যদের এবং সন্তান ও প্রতিবেশীদের হত্যা করবো আর আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে কি ছেড়ে দেবো? আল্লাহর কসম, তার দেখা যদি পাই তরবারি দিয়েই তার মোকাবিলা করবো'। আবু হুযায়ফার এই কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কানে পৌঁছে গেলো। তিনি উমর রাঃ-কে ডেকে বললেন, 'ইয়া আবু হাফ্স, -উমর রাঃ বলেন, জীবনে এই প্রথম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আমার উপনামে ডাকলেন- রাসুলের চাচার চেহারা কি আজ তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হবে?' উমর রাঃ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন তাকে [আবু হুযায়ফা বিন উতবা] হত্যা করে ফেলি। সে তো মুনাফিক হয়ে গেছে'। এই ঘটনার পর আবু হুযায়ফা বলেন, 'ঐ কথা বলার কারণে আমি কখনো স্বস্তি বোধ করি নি। যে-অপরাধ করেছি তার জন্যে ভয়ে ভয়ে থাকতাম। আমি ভাবতাম শহীদ হওয়া ছাড়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্য হবে না'। ইমামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আল্লাহপাক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আছেন।[২০]

১৬) কোনো কোনো হাদীসে এসেছে, এই কথা আউফ বিন আফরা নয়, বরং বলেছিলেন মুআয বিন আফরা। দেখুনঃ মুসান্নাফ ইবনে শাইবা, হাদিস নং ১৯৮৪৮ ও ১৯৪৯৯; তাফসির ফি যিলালিল কুরআন, সুরা আনফাল; আল-ফাতওয়া আদ-দীনিয়্যাহ ফিল আমালিয়্যাতিল ইস্তিশ্হাদিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১-২৭।

১৭) এই হাদিসের ভাষ্য বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে বিভিন্ন রকম এসেছেঃ কোথাও সত্তর জন, কোথাও পঞ্চাশ জন, কোথাও সকল মদিনাবাসীর কথা বলা হয়েছে; কোনো গ্রন্থে এসেছে, 'তার কি জানাযার নামায পড়া হবে অথচ সে ব্যভিচার করেছে? – উমর রাঃ এর এই জিজ্ঞাসার উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথা বলেছিলেন; কোনো গ্রন্থে আত্মোৎসর্গের পরিবর্তে তার উত্তম তওবার কথা বলা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন; ফয়যুল বারি শারহুল সহিহুল বুখারি, ১ম খণ্ড, পৃ ১০৩ ও ১০৪; মু'জাম আত-তাবরানি মাশকুলান, ১৬শ খণ্ড, পৃ ১৬১' আস-সুনানুল কুবরা, ইমাম নাসায়ি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৩৯।

---

১৮) বাবরাক কারমাল ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ থেকে ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬ পর্যন্ত আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯২৯ সালের ৬ই জানুয়ারি তিনি আফগানিস্তানের কামারাইতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৬ সালের ১লা বা ৩রা ডিসেম্ব্র মস্কোতে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯) কুরাইশরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুবকদের মাথা নষ্ট করেছেন বলে দোষারোপ করত।

২০) বিস্তারিত দেখুনঃ ইমাম ইসমাইল বিন উমর বিন দাউও ইবনে কাসির, তাফসিরুল কুরআনিল আযিম, দারুশ শাআব, ১৯৩০ হিজরি, ৪র্থ খণ্ড, সুরা আনফাল; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল আনসারি আলকুরতুবি, জামিউ লিআহকামিল কুরআন, দারল ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবি, বয়রুত, লেবানন, ১৯৮৫, ৮ম খণ্ড, পৃ ৪৯।

[পর্ব ১১]

মুখোমুখি লড়াই

বদর যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মুখোমুখি লড়াই হয়ে গেলো। উতবা বিন রবিয়া, তার ভাই শায়বা বিন রবিয়া এবং তার ছেলে ওয়ালিদ বিন উতবা রণাঙ্গনে নেমে এলো। তারা হুঙ্কার দিয়ে বললো, মুহাম্মদ, তুমি আমাদের সমকক্ষ বাছাই করে আনো তো দেখি! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা ও চাচাতো ভেইদের বেছে নিলেন। তিনি চাচা হামযা রাঃ, চাচাতো ভাই আলি বিন আবি তালিব রাঃ এবং উবাইদা বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব রাঃ কে বেছে নিলেন। উবাইদা বিন হারিস রাঃ উতবার, হামযা রাঃ শায়বার এবং আলি রাঃ ওয়ালিদের মোকাবিলা করলেন। হামযা রাঃ শায়বাকে হত্যা করলেন। উবাইদা বিন হারিস রাঃ উতবার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেলেন এবং দুজনই আহত হলেন। হামযা রাঃ ও আলি রাঃ সেদিকে ছুটে গেলেন এবং উতবাকে হত্যা করলেন। একটু পরেই উবাইদা বিন হারিস রাঃ মৃত্যুবরণ করেন। অথবা তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাঁধে মাথা রেখে কিছুক্ষণ পর শাহাদাতবরণ করেন। এই ঘটনা প্রেক্ষিতে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়-

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.

‘তারা দুটি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে; যারা কুফরি করে তাদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে উত্তপ্ত পানি- যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। এবং তাদের জন্যে থাকবে লোহার হাতুড়ি। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে;-আস্বাদ করো দহনযন্ত্রণা’। [সুরা হজঃ আয়াত ১৯-২২]

যুদ্ধের শুরুতে ব্যক্তি-বনাম-ব্যক্তি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা-সম্পর্কীয়দের থেকে যোদ্ধা বেছে নিয়েছিলেন যাতে প্রথম দল [মুহাজিরগণ[নিহত হলে আনসারিগণ মনে কোনো কষ্ট না পান; যাতে একথা বলা হয়ঃ যুদ্ধের শুরুতেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তারা হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের সদস্য এবং আমরা তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ নই।

উতবা বিন রবিয়া, তার ভাই শায়বা বিন রবিয়া এবং তার ছেলে ওয়ালিদ বিন উতবা নিহত হওয়ার পর যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমুঠো কঙ্কর হাতে নিয়ে কাফেরদের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিলেন এবং বললেন- شاهت الوجوه ... شاهت الوجوه চেহারাগুলো ধূলিধূসরিত হোক... চেহারাগুলো ধূলিধূসরিত হোক। শত্রুদের এমন কেউ অবশিষ্ট ছিলো না যার চোখে কঙ্কর প্রবেশ করে নি। উকাশা বিন মুহসিন রাঃ লড়াই করছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখে বললেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধা উকাশা। এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে তরবারি ছিটকে পড়ে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি ডাল এগিয়ে দেন এবং তিনি ডালটি হাতে নিয়েই দেখতে পান একটি প্রচণ্ড ধারালো সাদা তরবারি। পরবর্তী সময়ে তিনি এই তরবারি দিয়েই লড়াই করতেন। মুরতাদদের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই তরবারিটি তাঁর কাছে ছিলো। অথবা তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে তরবারিটি হারিয়ে ফেলেন।

[পর্ব ১২]

কাফের হয়েও বিশ্বস্ত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছিলেনঃ ‘তোমরা আবুল বুখতুরিকে সামনে পেলেও হত্যা করবে না’। কারণ-আমরা আগেই বলেছি-মুসলমানদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার যে-প্রজ্ঞাপন কাবাঘরে ঝোলানো ছিলো তা তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি মুজায্যার বিন যিয়াদ রাঃ বা বিন যিয়াদ আলবালবির সামনে পড়লেন। মুজায্যার রাঃ বললেন,

‘আবুল বুখতুরি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তোমাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এই জন্যে আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম’। আবুল বুখতুরির সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু ছিলো। তাই তিনি বললেন, ‘আমার বন্ধুকেও কি ছেড়ে দেবে?’ মুজায্যার রাঃ বললেন, ‘না, তাকে ছাড়বো না। তাকে ছেড়ে দেয়ার আদেশ পাই নি’। আবুল বুখতুরি বললেন, ‘তাহলে আমরা দুইজন একই সঙ্গে মরবো। আমি নিজে বেঁচে গিয়ে আমার বন্ধুকে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করতে পারি না’। কী আশ্চর্য! কাফের হয়েও তিনি কতটা বিশ্বস্ত! আমার ভাইয়েরা, এটাই হলো পৌরুষ, এটাই বন্ধুর প্রতি বন্ধুর হৃদ্যতা। আবুল বুখতুরি আরো বলেছিলেন, ‘আমি নিজেকে রক্ষা করবো না। কারণ মক্কার নারীরা বলবে, আমি আমার জীবনের মায়ায় অন্ধ হয়ে আমার বন্ধুকে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়েছি’।

لن يسلم ابن حرة زميله

حتى يموت أو يرى سبيله

‘বিন হির্‌রা তার বন্ধুকে কিছুতেই [শত্রুর হাতে] সমর্পণ করে নি;/ সে নিজে মরেছে এবং তার বন্ধুকে বাঁচাতে চেয়েছে’।

কে ছিলেন ইনি? আবুল বুখতুরি বিন হিশাম। তারা পুরুষ ছিলেন। বাস্তবিকই তাঁরা ছিলেন পুরুষ। অন্ধকার-যুগের এমন পুরুষদের এবং সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী নেতা আবু খালেদের মধ্যে তুলনা করে দেখুন।

ফিলিস্তিন-যুদ্ধের সময় সেখানে বানকাশ ও আরনাউতের একটি মুজাহিদ দল ছিলো। তাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্যে যুগোস্লাভিয়া থেকে ফিলিস্তিনে এসেছিলেন। তাঁরা আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের ভেতরে ছিলো শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা। এঁদের মুখেই আমি সর্বপ্রথম জিহাদে কারামত প্রকাশিত হওয়ার কথা শুনেছি। শায়খ আব্দুর রহমান আরনাউত আমাদের এলাকায় ইমাম ছিলেন। আমার বাবা তাঁকে চিনতেন। তিনি আমাকে বলেছেন, আমরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক, কুল আউযুবি রাব্বিন নাস, আয়াতুল কুরসি পড়তাম এবং আমাদের শরীরে ও জেকেটে মুছে দিতাম। আমরা হাজার হাজার ইহুদির ভেতরেও প্রবেশ করেছি। আমি সাতবার হাজার হাজার ইহুদির বেষ্টনীর ভেতরে পড়েছি। পাথরের ওপর বৃষ্টি যেমন পড়ে তেমনি আমার জেকেট থেকে পড়েছে।

আরব কর্তৃক ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। যুগোস্লাভিয়ার মুজাহিদরা তখন দামেস্কে বসবাস করতেন। ১৯৫৮ সালে মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে মৈত্রীচুক্তি[২১] সম্পাদিত হওয়ার পর আবদুন নাসের তার ভাই মার্শাল টিটোকে জিজ্ঞেস করে, 'এই মৈত্রীচুক্তির উপঢৌকন হিসেবে আপনি কী চান?' মার্শাল টিটো বলে, 'আপনাদের কাছে যুগোস্লাভিয়ার বসনিয়া ও আরনাউতের একদল রাজনৈতিক আশ্রিত রয়েছে। তাদেরকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করুন'। আবদুন নাসেরের মধ্যস্থতায় সিরিয়ায় আশ্রিত মুজাহিদদেরকে মার্শাল টিটোর কাছে সোপর্দ করা হয়। পরের দিনই তাদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

অথচ জাহেলি যুগের আবুল বুখতুরি বিন হিশাম কী বলেছিলেন, 'আমি একা বাঁচবো না। আমার বন্ধুর ব্যাপারে তোমাদের কী সিদ্ধান্ত?' মুজায্যার রাঃ বললেন, 'না, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তোমার ব্যাপারে নিষেধ করছেন'। আবুল বুখতুরি বললেন, 'আল্লাহর কসম, তাহলে আমি এবং আমার বন্ধু একই সঙ্গে মরবো। আমি চাইনা মক্কার নারীরা বলুক আমি আমার জীবন বাঁচাতে বন্ধুকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করেছি'। কী আশ্চর্যজনক! তাঁদের পৌরুষ ছিলো; তাঁরা ছিলেন বীরপুরুষ। সত্যই তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী।

আবু সুফ্য়ান তখন কাফের ছিলেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমাদের নবীকে কি কেউ এই অপবাদ দিয়েছে যে তিনি মিথ্যাবাদী?' আবু সুফ্য়ান বললেন, 'না, তাঁকে এই অপবাদ কেউ দেয় নি'। আবু সুফ্য়ান পরে বলেছেন, 'আমি আশঙ্কা করছিলাম আমার থেকে কোনো মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ে কি-না'। সত্যই তাঁরা সত্যবাদী ছিলেন। সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন বীরপুরুষ। হ্যাঁ, এটা সত্য যে তাঁরা জাহেলি যুগে ছিলেন, ভ্রান্ত ছিলেন; কিন্তু সৎ মানুষের গুণাবলি তাঁদের ভেতরে ছিলো। এইসবই হলো সৎমানুষের গুণ।

উমাইয়া বিন খাল্ফ বদরের ময়দানে বেরিয়ে এলো। সে বীরপুরুষ হলেও অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলো। শরীর ছিলো মোটা ও থলথলে। বৃহৎ মৃতদেহ থেকে যেনো চর্বি গলে গলে বেরোচ্ছিলো। কুরাইশ দল তখন পালাতে শুরু করেছে। উমাইয়া বিন খাল্ফ দৌড়াতে পারছিলো না। সে তো আর সাদা এবং জাজির ঘাঁটিতে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয় নি! আবদুর রহমান বিন আওফ রাঃ বলেন, 'আমার কাছে বেশ কয়েকটি ঢাল ছিলো; গনিমত হিসেবে আমি সেগুলো সংগ্রহ করেছিলাম। হঠাৎ দেখি উমাইয়া বিন খাল্ফ এবং তার ছেলে আলি আমার সামনে দাঁড়ানো। সে আমাকে ডেকে বললো, হে আবদুল ইলাহ, -(আবদুর রহমান বিন আউফের নাম ছিলো আবদু আমর। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজে বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান। উমাইয়া তাঁর বন্ধু ছিলো। মক্কায় দেখা হলে সে তাঁকে আগের নাম আবদু আমর বলেই ডাকতো। কিন্তু

আবদুর রহমান বিন আওফ তার ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি বললেন, 'আমার নাম আবদুর রহমান। আমাকে এখন এই নামে ডাকবে। আগের নামে ডাকলে আমি সাড়া দেবো না'। উমাইয়া বললো, 'রহমান বলতে আমি কাউকে চিনি না। রহমানের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই। আমি তোমাকে ওই নামে ডাকতে পারবো না। আচ্ছা যাও, আমি তোমাকে ভিন্ন নামে ডাকবো। আবদুল ইলাহ বলে ডাকবো তোমাকে'। তাই আবদুল ইলাহ বলে ডাকলে আবদুর রহমান বিন আওফ সাড়া দিতেন।)- আমার ব্যাপারে কিছু চিন্তা করো আর তোমার হাতের ঢালগুলো রেখে দাও। এই ঢালগুলো থেকে আমিই তোমার জন্যে বেশি লাভজনক। আমার কাছে টাকাপয়সা অনেক আছে; আমি তোমাকে মুক্তিপণ দেবো'। আবদুর রহমান বিন আউফ বলেন, 'আমি হাতের ঢালগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম এবং একহাতে উমাইর আরেক হাতে তার ছেলে আলিকে ধরলাম। উমাইয়া বললো, আজকের মত দিন আমার জীবনে আর আসে নি। আজেকে এই জাতি দুধ ভালোবাসছে না। দুধাল উটও আজ তাদের পছন্দ হচ্ছে না। কেউ আমাকে বন্দি হিসেবে ধরতে রাজি হয় নি। যদিও আমি তাদেরকে দুধাল উট দিতে চেয়েছি'। আবদুর রহমান বলেন, 'আমি তাদের দুইজনকে দুই হাতে ধরে চলতে শুরু করলাম। আমি তাদের মধ্যখানে হাঁটছিলাম এবং আনন্দ বোধ করছিলাম'।

আবদুর রহমান বিন আওফ ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি ঢালগুলো ফেলে দিয়ে তাদেরকে বন্দি হিসেবে ধরলেন। এভাবে তিনি লাভবান হলেন। তিনি বলেন, 'বেলাল যখন দেখলেন আমি উমাইয়া এবং তার ছেলের হাত ধরে আছি, বললেন, কুফরির মাথাই যদি বেঁচে গেলো তাহলে তো আপনি বাঁচলেন না। মক্কার উপকণ্ঠে ও মরুভূমিতে আমাদের ওপর যে-পাশবিক নির্যাতন করা হতো তার কথা স্মরণ করুন'। আবদুর রহমান বিন আওফ বললেন, 'বেলাল, এরা দুইজন আমার বন্দি'। বেলাল রাঃ আবার বললেন, 'কুফরির মাথাই যদি বেঁচে গেলো তাহলে তো আপনি বাঁচলেন না'। আবদুর রহমান বিন আওফ বললেন, 'ওহে কৃষনাঙ্গ মায়ের ছেলে, এরা দুইজন আমার বন্দি'। [আবদুর রহমান বিন আওফ উমাইয়া বিন খাল্‌ফকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সে মদিনায় এসে যদি কোন বিপদে পড়ে বা শত্রুর হাতে পড়ে তাহলে তিনি রক্ষা করবেন। ইসলামে প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাই তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন।] বেলাল রাঃ আবার বললেন, 'কুফরির মাথাই যদি বেঁচে গেলো তাহলে তো আপনি বাঁচলেন না'। বেলাল রাঃ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি যদি মুহাজিরদের ডাকি, তারা তো উমাইয়াকে হত্যা করবে না। আমি যাদের কাছে উমাইয়ার নির্যাতনের গল্প বলেছি, তাদেরকেই আমি ডাকতে চাই। তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে তাদের অন্তর ভরে আছে এবং তারা তাকে চেনে না। তিনি ডাকলেন 'হে আনসার সম্প্রদায়, কাফেরদের নেতা উমাইয়া বিন খাল্‌ফ এই যে এখানে'। এই আহ্বান শুনে আনসারি তরুণেরা উমাইয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাফেরদের নেতাদের বিরুদ্ধে মুসলিম যুবকদের

ভেতর দৃঢ় চেতনা থাকা উত্তম ও অপরিহার্য। তাদের সঙ্গে মুসলিম যুবকদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। যুবকেরা যদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে, তাদের সঙ্গে উঠাবসা করে, চা-কফি পান করে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং আরো নানা প্রক্রিয়ায় সম্পর্ক স্থাপন করে, তাদের ভেতর থেকে পবিত্রতা, বিশ্বস্ততা এবং ঈমানের চেতনা হ্রাস পাবে।

এ-কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেয়েছিলেন যে মুসলমানেরা যেনো কাফেরদের সঙ্গে মাখামাখি না করে। তিনি চেয়েছিলেন, তারা যেনো কাফেরদের মধ্যে বসবাস না করে। কারণ, কাফেরদের সঙ্গে বসবাস ও মাখামাখি; তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা অব্যাহত রাখলে মুসলমানদের মধ্য থেকে সৎ গুণাবলী হ্রাস পাবে। মুসলমানেরা সেই দিনগুলোর কথা ভাববে [এবং দুর্বল হবে] যখন তারা কাফেরদের প্রতিবেশী ছিলো, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিলো এবং তাদের মধ্যে নানা কার্যক্রম ছিলো। আনসারী যুবকেরা বিশুদ্ধ চেতনার অধিকারী। কাফেরদের সঙ্গে তাদের চা-রুটি-লবণ-পেঁয়াজের বিনিময় হয় নি।

আনসারি তরুণেরা জমায়েত হলে বেলাল রাঃ উমাইয়াকে আঘাত করলেন। আবদুর রহমান বিন আওফ তাকে বললেন, 'তুমি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করো। মনে হয় আমি তোমাকে বাঁচাতে পারবো না। এক কাজ করো, তুমি শুয়ে পড়ো'। উমাইয়া শুয়ে পড়লো। আবদুর রহমান বিন আওফ তার ওপর ঝাঁপ দিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং এমনভাবে ঢেকে রাখলেন যাতে তাঁকে না মেরে কেউ উমাইয়াকে আঘাত করতে না পারে। কিন্তু আনসারি তরুণেরা উত্তেজিত হয়ে পড়লো। তারা আবদুর রহমান বিন আওফের পায়ের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে উমাইয়াকে আঘাত করতে লাগলো। তিনি উমাইয়াকে বললেন, 'তুমি কি পালাতে পারবে? পালাতে পারলে এখন পালিয়ে যাও। আমি তোমাকে সাহায্য করি'। কিন্তু বিরাট থলথলে দেহ নিয়ে সে পালাবে কোথায়? সে আনসারি তরুণদের মার খেতেই থাকলো এবং এক সময় মারা গেলো। তার ছেলে আলিও আনসারি তরুণদের হাতে মারা পড়লো। আবদুর রহমান বিন আওফ বলেন, 'আল্লাহপাক আমার ভাই বেলালকে রহম করুন। হাতে-পাওয়া ঢাল এবং বন্দি উভয়টির ব্যাপারেই তিনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। তাঁর কারণেই আমি ঢালগুলোও খুইয়েছি, বন্দিও খুইয়েছি। সেদিন আমি এক পয়সাও লাভ করতে পারি নি'।

২১) ১৯৫৮ সালে সিরিয়া ও মিসর একত্র হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

[পর্ব ১৩]

ফেরশতাদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে ফেরেশতারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং যুদ্ধ করেছেন। এ-ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, 'আমি এবং আমার চাচাত ভাই পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গনিমত কোথায় পাওয়া যায় তা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। হঠাৎ আমাদের মাথার ওপর দিয়ে মেঘমালা উড়ে গেলো, তাতে অসংখ্য ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো এবং বলা হচ্ছিলো, হাইযুম[২২] এগিয়ে আসছে। এই শব্দ শুনে আমার চাচাতো ভাই প্রচণ্ড ভয় পেলো এবং অস্থির হয়ে উঠলো। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সে মারাই গেলো। আমিও ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু নিজেকে সংযত রাখলাম'।[২৩]

আবু সাঈদ মালিক বিন রবিয়া রাঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রণ করেছিলেন এবং শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আজ যদি আমি বদর প্রান্তরে থাকতাম এবং আমার দৃষ্টিশক্তি থাকতো তাহলে আমি তোমাদেরকে সেই উপত্যকা দেখাতাম যেখান থেকে ফেরেশতারা বের হয়ে এসেছিলেন। তাতে আমার কোনো সংশয় নেই এবং আমি সন্দেহও পোষণ করি না'।[২৪]

আবু দাউদ আলমাযিনি রাঃ বলেন, -তিনিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন- 'আমি বদর যুদ্ধের দিন একটি মুশরিককে হত্যা করার জন্যে ধাওয়া করলাম। কিন্তু আমার তরবারি তার মাথার কাছে পৌঁছার আগেই দেখলাম তার মাথা ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম তাকে অন্যকেউ হত্যা করেছে'।[২৫]

আবু যামিল আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, 'সাহাবিদের একজন মুশরিকদের একটি লোকের পেছনে দ্রুত ধাওয়া করেছিলেন। তিনি মুশরিকটির ওপর চাবুকের আঘাতের শব্দ পান। তিনি বলেন, 'মুশরিকটি তার ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। আমি নেমে গিয়ে দেখি তার শরীরের যেসব জায়গায় চাবুকের আঘাত লেগেছিলো তার সবটুকু-চোখ-মুখ-ঠোঁট-গোটা চেহারা সবুজ হয়ে আছে। [সবুজ বলতে কালো বুঝিয়েছেন।] আমি তাকে মুমূর্ষ অবস্থায় পেলাম; তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছিলো'।[২৬]

বদর যুদ্ধের দিন তারা ফেরেশতাদের হাতে নিহত এবং সাহাবিদের হাতে নিহতদের আলাদা করেছিলেন। যাদের দেহে চাবুকের আঘাতের চিহ্ন পেয়েছিলেন তাদেরকে ফেরেশতাদের হাতে নিহত বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আল্লাহপাক বলেন-

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ 'তুমি যদি দেখতে পেতে ফেরেশতাগণ কাফেরদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে, তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ করো'। [সুরা আনফালঃ আয়াত ৫০]

এই বিষয়টি নিশ্চিত যে আফগানিস্তানের যুদ্ধে ফেরেশতারা অংশগ্রহণ করেছিলো। তেমনিভাবে মুমিন জিনেরাও নিশ্চিতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো। ঘটনা অনেক আছে। যারা সমতল ভূমি ও পাহাড় ভরে রেখেছিলো তাদের ঘটনা; যারা অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধ করেছিলো তাদের ঘটনা; যারা সাদা পোশাক পরে এসেছিলো তাদের ঘটনা; যারা জানাযার নামায পড়েছিলো তাদের ঘটনা। আমি এসব ঘটনা আমার আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান[২৭] এবং ইবারুন ওয়া বাসায়ির লিল-জিহাদি ফিল আসরিল হাদির বই দুটিতে বর্ণনা করেছি। কারো আরো বেশি জানার ইচ্ছে হলে সেই বই দুটি পড়ে দেখতে পারেন।

ইবারুন ও বাসায়ির লিল-জিহাদ-এ আমি যে-সব ঘটনা উল্লেখ করেছি তার একটি হলো কমান্ডার মুসলিমের ঘটনা। কমান্ডার মুসলিম এবং কমান্ডার সফিউল্লাহ আহমদ শাহ মাসউদের নেতৃত্বে ছিলেন। ইনি সফিউল্লাহ আফদালি নন; অন্য সফিউল্লাহ। তাঁরা দুজন একদিন শত্রুদের একটি কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করার ব্যাপারে একমত হন। সফিউল্লাহ কমান্ডার মুসলিমকে বলেন, আপনি ভারী অস্ত্র নিয়ে পেছন থেকে সাপোর্ট দেবেন আর আমরা কেন্দ্রস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আক্রমণের নির্দিষ্ট সময়ে শত্রুদের কেন্দ্রস্থলে ভারী ভারী গোলা পড়তে শুরু করলো। আল্লাহপাকের অনুগ্রহে কিছুক্ষণের মধ্যেই কমান্ডার সফিউল্লাহ ঘাঁটটি দখল করে নেন। এই অভিযানের পর তাঁরা নদীর দুই পাশে দুই ঘাটিতে চলে যান। এর এক বা দুই সপ্তাহ পর সফিউল্লাহ কমান্ডার মুসলিমকে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। সেদিন আপনারা যে-গোলাগুলো ছুঁড়েছিলেন সেগুলো শত্রুঘাঁটির একেবারে মধ্যস্থলে গিয়ে পড়েছিলো। আপনি একেবারে লক্ষ্যস্থলেই গোলা ছুঁড়েছেন। যেনো আপনি নিজ হাতে গোলাগুলো সেখানে রেখে দিয়েছেন। কমান্ডার মুসলিম বিস্মিত হয়ে বললেন, কখন আমি এই কাজ করেছি? আপনি কোন্ দিনের কথা বলছেন? সফিউইল্লাহ বললেন, এই তো দুই সপ্তাহ আগে। কেনো আপনার মনে নেই আমরা যে কেন্দ্রঘাঁটিতে আক্রমণ করার ব্যাপারে একমত হলাম? মুসলিম বললেন, কী কথা বলছেন! আল্লাহর কসম, সেদিন তো আমরা একটি গোলাও ছুড়ঁতে পারি নি। নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে কোত্থেকে ভারী ভারী গোলা এসে

পড়লো? সেদিন শত্রুবিমান আমাদের ওপর বোমা বর্ষণ করছিলো এবং নিজেদের বাঁচাতেই আমরা ব্যস্ত ছিলাম।

কিছুদিন পর একজন মুজাহিদ জিনে আক্রান্ত হলেন। জিন তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেললো। ঘটনা শুনে একজন আলেম এলেন এবং আক্রান্ত মুজাহিদের ওপর সুরা পড়তে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি জিনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি জিনকে বললেন, এই ব্যাটা, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। তুমি তাকে ছেড়ে দাও। জিন বললো, আমি তাকে কেনো ছাড়বো? আমি তো তাকে জিহাদে সহায়তা করি। আলেম বললেন, তুমি ছেড়ে দাও। তুমি তাকে ছেড়ে চলে যাও। সে নিজেই জিহাদ করতে পারবে। আচ্ছা, তুমি তাকে কীভাবে জিহাদে সহায়তা করো। জিন বললো, সফিউল্লাহ যেদিন শত্রুর ঘাটিতে আক্রমন করলেন সেদিন কে ভারী ভারী গোলা নিক্ষেপ করেছিলো? জিন আরো বললো, কে ভারী অস্ত্র চালিয়েছিলো? কমান্ডার মুসলিম তো ভারী অস্ত্র চালান নি। তাহলে কারা সেসব অস্ত্র চালিয়েছিলো? জিন বললো, আমরাই সেসব ভারী অস্ত্র চালিয়েছিলাম; আমরা ছাড়া আর কেউ নয়। এখন বুঝতে পেরেছেন কীভাবে জিহাদে সহায়তা করি? এরকম অজস্র ঘটনা আছে। আফগানিস্তানের জিহাদে ফেরেশতা ও জিনদের অংশগ্রহণের ঘটনা অসংখ্য।

যাই হোক। বদর যুদ্ধের ঘটনায় ফিরে আসি। যুদ্ধে বিজয় লাভের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশের বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে মদিনায় চললেন।[২৮] যাওয়ার পথে তিনি নদর বিন হারেসকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তাকে হত্যা করা হলো। এরপর তিনি উকবা বিন আবু মুয়িতকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। উকবা বললো, হে মুহাম্মদ, আমার সঙ্গীদের কী অবস্থা হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের জন্যে জাহান্নাম। উকবাকেও হত্যা করা হল। সত্তরজন বন্দিকে মদিনা মুনাওয়ারা নিয়ে যাওয়া হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিয়ে মদিনায় পৌঁছলেন। আল-হায়সুমান বিন আবদুল্লাহ আল-খুযায়ি মক্কাবাসীকে বদর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে জানানোর জন্যে মক্কায় গেলেন। তখন সাফওয়ান বিন উমাইয়া পাথুরে জমিনে বসেছিলো। আল-হায়সুমান বিন আবদুল্লাহ মক্কায় প্রবেশ করলেন। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, যুদ্ধের ফলাফল কী? তিনি বললেন, শায়বা নিহত হয়েছে। ওয়ালিদ বিন উতবা নিহত হয়েছে। উতবা বিন রবিয়া নিহত হয়েছে। তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকে [আবু জাহ্লকে] হাজ্জাজের দুই ছেলে [মুআয বিন আফরা ও মুআওয়ায বিন আফরা] হত্যা করেছে। আবুল বুখতুরি বিন হিশাম নিহত হয়েছে। উমাইয়া বিন খাল্ফও নিহত হয়েছে। সাফওয়ান বিন উমাইয়া তখনো পাথুরে জমিনে বসেছিলো। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, সাফওয়ান বিন উমাইয়ার খবর কী সে কি নিহত হয়েছে না-কি বেঁচে আছে? আল হায়সুমান বিন আবদুল্লাহ বললেন, সে পাথুরে

জমিনে বসে আছে। আমি তার বাবাকে [উমাইয়া] ও ভাইকে [আলি বিন উয়ামাইয়া] নিহত হতে দেখেছি।

কিন্তু মক্কার লোকেরা কিছুতেই এই খবর বিশ্বাস করতে পারলো না। কীভাবে বিশ্বাস করবে? কুরাইশের মাথা যারা ছিলো বদর যুদ্ধে তারাই নিহত ও বন্দি হয়েছিলো। আবু লাহাবও এই সংবাদ শুনতে পেলো এবং সে তার প্রতিক্রিয়া দেখালো। আবু রাফে বলেন, -আবু রাফে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের গোলাম ছিলেন- আমি যমযম কূপের পাশে একটি তাঁবু টানিয়ে সেখানে মাটির পাত্র তৈরি করতাম। সেদিন যমযমের কামরায় আমি কয়েকটি পাত্র বানিয়ে রেখেছিলাম। আবু সুফ্য়ান বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেখানে উপস্থিত হলো। আবু লাহাবও তার পা টেনে টেনে সেখানে উপস্থিত হলো। উম্মুল ফযলও সেখানে বসেছিলেন। উম্মুল ফযল ছিলেন আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী। আবু লাহাব যমযমের কামরার দরজায় বসলো। সে আবু সুফ্য়ানকে বললো, -সুফ্য়ানের নাম ছিলো সাফ্ওয়ান বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব-ভাতিজা, যা ঘটেছে আমাকে বলো। আবু সুফ্য়ান বললো, ঘটনা বেশি কিছু নয়। আমরা তাদের [মুসলমানদের] মোকাবিলা করতে গিয়েছিলাম-আমরা আমাদের নেতাদের তাদের কাছে সোপর্দ করে এসেছি। যারা নিহত হওয়ার তারা নিহত হয়েছে। আর যারা বন্দি হওয়ার তারা বন্দি হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি এর জন্যে কাউকে দোষারোপ করি না। কারো নিন্দা করতে চাই না। সাদা-কালো দাগঅলা ঘোড়ায় চড়ে শুভ্র পোশাক পরিহিত কিছু মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাদেরকে আমরা চিনি না। আবু রাফে তখন নিজেকে সংযত রাখতে পারেন নি। তাঁবুর দিকে ছুটে গেলেন। যদিও তিনি কুরাইশের দাস। আবু লাহাব সেখানেই বসেছিলো। তিনি তার সামনে গিয়ে বললেন, তারা ছিলেন ফেরেশতা। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবু লাহাব প্রচণ্ড জোরে তাঁকে চড় মারে। আবু রাফে বলেন, আমি আবু লাহাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তাঁর আত্মসম্মানবোধ জেগে উঠেছিলো। (আমরাও আরব। আমরা দূর থেকেও আফগানদের সম্মান পাই এবং ফিলিস্তিনে আমরা ইহুদিদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।) আবু রাফে আবু লাহাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে একজন ক্রীতদাস মক্কার বিশিষ্ট নেতা আবু লাহাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আবু রাফে বলেন, আমি খুবই চিকন ও হালকা ছিলাম। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ার পর আবু লাহাব নিজেকে সামলে নেয় এবং আমাকে তুলে নিয়ে মাটিতে আছাড় মারে। এরপর আমার বুকের ওপর উঠে বসে এবং মারতে শুরু করে। উম্মুল ফযল কাছেই ছিলেন। তিনি একটি পাথুরের টুকরো নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং আবু লাহাবের গায়ে মারলেন। তাকে বললেন, ওঠো, ছাড়ো তুমি তাকে। তার মনিব মক্কায় উপস্থিত নেই; তাকে তুমি একা পেয়েছো? তাকে দুর্বল পেয়ে তার বুকের ওপর বসে মারতে শুরু করেছো? আবু লাহাব নিজেকে টেনে টেনে তুললো। এরপর সে আর সাতদিনের বেশি বাঁচে নি। সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত

হয়েছিলো। আবু লাহাবের মৃত্যুর পর কেউ তাকে গোসল করাতে এবং কাফন পড়াতে এগিয়ে আসতে পারে নি। কারণ গোটা শরীরে ক্ষত ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং পচন ধরেছিলো।

কুরাইশ বদর যুদ্ধে নিহতদের জন্যে কান্না ও শোকপ্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিলো। তারা মনে করেছিলো, এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিদের আনন্দ বেড়ে যেতে পারে এবং তাঁরা এটা নিয়ে হাসাহাসি করতে পারেন। আল-আসওয়াদ বিন আবদুল মুত্তালিবের তিন সন্তান-সুই ছেলে আবু হাকিমা যামআতা বিন আসওয়াদ, উকাইল বিন আসওয়া এবং এক নাতি হারিস বিন যামআতা- বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। তিনি অন্ধ ছিলেন। শোকে তাঁর বুক ফেটে যেতে চাচ্ছিলো। কষ্টের আগুন তাঁর হৃদয় পুড়ে যাচ্ছিলো। তিনি তাঁর সন্তানদের জন্যে কাঁদতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু কুরাইশ নিহতদের জন্য কান্না নিষিদ্ধ করেছিলো। তিনি চাইলেও কাঁদতে পারছিলেন না। একরাতে তিনি এক নারীর কান্না শুনতে পান। তিনি তাঁর এক গোলামকে বললেন, তুমি বের হয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখো, সম্ভবত কুরাইশ কান্নার অনুমতি দিয়েছে। গোলাম সেই নারীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কুরাইশ কি নিহতদের জন্যে কান্নার অনুমতি দিয়েছে? মহিলাটি বললো, না। তাছাড়া আমি নিহতদের জন্যে কাঁদছি না। আমার একটি উট হারিয়ে গেছে তাই আমি কাঁদছি। এই খবর শুনে আসওয়াদ বিন মুত্তালিব একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। সেই কবিতা থেকে যেনো কষ্ট ও ব্যাথা ঝরছিলো।

أتبكى أن يضل لها بغير*ويمنعها من النوم السهود

فلا تبكى على بكر , ولكن* على بدرتقاصرت الجدود

على بدر سراة بنى هصيص* ومخزوم ورهط أبى الوليد

وبكى إن بكيت على عقيل* وبكى حارثا أسد الاسود

وبكيهم ولا تسمى جميعا* وما لابي حكيمة من ندید

ألا قد ساد بعدهم رجال* ولولا يوم بدر لم يسودوا

‘সে কি এজন্যে কাঁদছে যে তার একটি উট হারিয়ে গেছে আর তাকে বিনিদ্র রেখেছে রাত্রি-জাগরণ?/ [হে নারী,] তুমি উটের বাচ্চার জন্যে কেঁদো না; বরং বদর যুদ্ধের ফলাফলে কাঁদো, সেখানে আমাদের মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।/ বনু হাসিস, বনু মাখযুম এবু আবু ওয়ালিদের বংশধরদের জন্যে কাঁদো, যারা ছিলো বদরে নৈশ অভিযাত্রী।/ তুমি যদি কাঁদতেই চাও- তাহলে উকাইলের জন্যে কাঁদো এবং কাঁদো হারিসের জন্যে যে ছিলো সিংহদেরও সিংহ।/ তুমি তাদের

জন্যে কাঁদো; কিন্তু সবার নাম নিও না। এবং আবু হাকিমাতা তো ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী।/ হায়! তাদের পরেও তো অনেক মানুষ নেতৃত্ব দেবে। হায়! তারা যদি বদরের দিন নেতৃত্ব না দিতো'। বন্দিদের নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা মুাওয়ারায় এলেন। সুহাইল বিন আমরের দুই হাত বাঁধা ছিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনসঙ্গিনী সাওদা রাঃ বলেন, আমি তখন রাসুলের কাছে গেলাম এবং সুহাইল বিন আমরকে দুই হাত বাঁধা অবস্থায় বসে থাকতে দেখলাম। আল্লাহর কসম, আমি তখন নিজেকে সংযত রাখতে পারি নি। আমি সুহাইলকে বললাম, হে আবু ইয়াযিদ, আপনারা কি এভাবেই নিজেদের সমর্পণ করলেন? আপনারা কি লড়াই করতে পারলেন না এবং সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে পারলেন না? সাওদা রাঃ-এর এসব কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, হে সাওদা, তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করছো? সাওদা রাঃ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি তাঁকে যখন এভাবে দেখছি নিজেকে সংযত রাখতে পারি নি। সুহাইল বিন আমর ছিলেন মক্কার নেতা আর এখানে তিনি হাতবাঁধা ও ধুলোয় নিক্ষিপ্ত! তিনি আমাদের নিকটাত্মীয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, আমরা এই বন্দিদের সঙ্গে কী আচরণ করবো? উমর রাঃ বললেন, বন্দিদের মধ্যে যারা আমার নিকটাত্মীয় তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন; আমি তাদেরকে হত্যা করবো। আকিলকে আলির হাতে ছেড়ে দিন; সে তাকে হত্যা করুক। আবু বকরের কাছে তার ছেলেকে দিন; তিনি তাকে হত্যা করবেন। হামযার কাছে তার নিকটাত্মীয়দের দিন; সে তাদেরকে হত্যা করবে। আমরা তাদের সবাইকে হত্যা করব। তারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে আর ফিরে আসতে পারবে না। আব্বাস রাঃ-ও বন্দিদের মধ্যে ছিলেন। বন্দিদেরকে হত্যা না করার ব্যাপারেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঝোঁক ছিলো। আবু বকর রাঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই মনোবাঞ্ছাকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, বন্দিদের সবাই আপনার পিতৃ-সম্প্রদায় এবং তারা আপনার আত্মীয়-স্বজন। আমি মনে করি, আপনি তাদের ছেড়ে দিয়ে মুক্তিপণ গ্রহণ করবেন। আবু বকর রাঃ –এর কথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু বন্দিদের ছেড়ে দিয়ে মুক্তিপণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে আল্লাহপাক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তিনি আয়াত নাযিল করলেন-

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

‘দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোন নবীর জন্যে সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ চান পরকালের কল্যাণ; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব-বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো তার জন্যে তোমাদের ওপর আপতিত হতো মহাশাস্তি’। [সুরা আনফালঃ আয়াত ৬৭-৬৮]

মুসআব বিন উমায়ের রাঃ-এর ভাই আবু আযিযও বন্দিদের মধ্যে ছিলো। সাহাবি আবুল ইয়াসার রাঃ তাকে ধরে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের পাশ দিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন, একে ভালো করে ধরে রাখো। এর মায়ের ধন-সম্পদ অনেক। তিনি তোমাকে অনেক বেশি অর্থ দিয়ে একে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। বন্দি আবু আযিযের মা মানে মুসআব বিন উমায়ের রাঃ-এরও মা। আবুল ইয়াসার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই আল্লাহর কসম, আমার ভাইয়ের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের চেয়ে তোমার সঙ্গে আমার ভ্রাতৃত্ব অনেক দৃঢ়।

একেই বলে আকিদা ও বিশ্বাস। আকিদা ও বিশ্বাস যখন অন্তরে বদ্ধমূল হবে তখন আলাদা ভ্রাতৃত্ব বা পিতৃত্ব বলে কিছু থাকবে না। তখন ভ্রাতৃত্ব হবে ঈমানের ভ্রাতৃত্ব, ইসলামের ভ্রাতৃত্ব, কুরআন-সুন্নাহ ও আকিদার ভ্রাতৃত্ব।

এভাবেই আল্লাহপাক মুমিনদের সাহায্য করেন। তাদের শক্তিকে সংহত করেন। তাদের পতাকাকে সমুন্নত করেন। আর এভাবেই কাফেরদের লাঞ্ছিত করেন। তাদের শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে সম্মানিত করেন। নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

---

২২) হাইযুম (حيزوم) জিবরাইল আঃ-এর ঘোড়ার নাম। শব্দটির সাধারণ অর্থঃ বুকের মধ্যস্থল বা মধ্যবুক।

২৩) আবু ইসহাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম আস্সা’লাবি আন্নিসাপুরি, আলকাশ্ফু ওয়াল বায়ান, দারুল ইহ্ইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বয়রুত, লেবানন, ২০০২, সুরা আনফাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩৩৪; ইমাম আবুল ফারজ জামালুদ্দিন আবদুর রহমান বিন আলি বিন মুহাম্মদ আলজাওযি আলকুরশি আলবাগদাদি [মৃ ৫৯৭ হিজরি], যাদুল মাসির ফি ইলমিত্ তাফসির, দারুল ফিকরি, বয়রুত, লেবানন, ১৯৮৭, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯।

২৪) আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন মাখলুফ আবু যায়েদ আস্সাআলিবি আলমালিকি, জাওয়াহিরুল হাসান ফি তাফসিরিল কুরআন, দারু ইহ্ইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বয়রুত, লেবানন, ১৯৯৭, ৫ম খণ্ড, প্ররঃ ১২১; সীরাতুন্নবী সাঃ, রচনাঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার আলমুত্তালিবি [মৃ ১৫১ হিজরি], বিন্যাসঃ আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক বিন হিশাম বিন আইয়ুব আলহিময়ারি [মৃ ২১৮], মাকতাবা মুহাম্মদ আলি সাবিহ, মায়দানুল আযহার, মিসর, ১৯৬৩, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭; ইমাম ইসমাইল বিন উমর বিন দাউও ইবনে কাসির, আসসীরাতুন্ নাবাবিয়্যাহ, অধ্যায়ঃ বদরে ফেরেশতাদের যুদ্ধ, ২য় খণ্ড, পৃ ৪২৬।

২৫) আলাউদ্দিন আলি বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম আলবাগদাদি, আত্তা’বিল ফি মাআনিত্ তানযিল, দারুল ফিকরি, বয়রুত, লেবানন, ১৯৭৯, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস ২৩৭৭৮, ২৩৮২৯।

২৬) আবুল কাসেম মাহমুদ বিন উমর আয্যামাখশারি আলখাওয়ারিযমি, আলকাশ্শাফ আন হাকায়িকিত্ তানযিল ওয়া উয়ুনিল আকাবিল ফি উজুহিত্ তা’বিল, দারু ইহ্ইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বয়রুত, লেবানন, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯১; ইমাম

ইসমাইল বিন উমর বিন দাউও ইবনে কাসির, আসসীরাতুন্ নাবাবিয়্যাহ, অধ্যায়ঃ বদরে ফেরশতাদের যুদ্ধ, খণ্ড, পৃঃ ৪২৬।
২৭) আমি আফগানিস্তানে আল্লাহকে দেখেছি নামে বইটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন উবায়দুর রহমান খান নদভী।
২৮) এর আগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাবাসীদের যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা রাঃ-কে মদিনার উঁচুতল ভাগে (পার্বত্য এলাকা) এবং যায়দ বিন হারেসা রাঃ-কে মদিনার নিম্নতল ভাগে (নগরে) পাঠিয়েছিলেন।

[পর্ব ১৪]

অহুদের যুদ্ধঃএক

বদর যুদ্ধ শেষ হলো। আমরা আজ কথা বলছি ১৯৮৮ সালের জুন মাসের একুশ তারিখে বা ১৪০৮ হিজরির যিলকদ মাসের সাত তারিখে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ী হয়ে মদিনায় ফিরে এলেন। আল্লাহপাক তাঁর দীনকে শক্তিশালী করলেন। তিনি সত্তরজন বন্দি থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদের ছেড়ে দিলেন। আসার পথে তিনি-যেমন আমরা আগেই বলেছি-নদর বিন হারিস ও উকবা বিন আবু মুয়িত বাদে আর কাউকে হত্যা করেন নি। নদরকে সাফরায় এবং উকবাকে ইরকুয যবিয়্যাতে হত্যা করা হয়েছিলো। কিন্তু বন্দিদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তিপণ দেয়ার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভ সনাবাণী অবতীর্ণ হয়েছিলো। পবিত্র কুরআন এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, রাসুলের জন্য শুরুতেই যা শ্রেয় তা হলো শত্রুকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা। এক্ষেত্রে আল্লাহপাকের বাণীর সঙ্গে হযরত উমর বিন খাত্তাব রাঃ-এর সিদ্ধান্ত সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। যেমন- মদপান। যখনই মদের ব্যাপারে কুরআন আয়াত নাযিল হলো, উমর রাঃ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাদের জন্যে মদপানের বিধি-বিধান বিশদভাবে বর্ণনা করো। তখন নাযিল হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য-নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা সেগুলো বর্জন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো’। [সুরা মায়েদাঃ

আয়াত৯০]

আরেকটি বিষয়েও উমর বিন খাত্তাব রাঃ-এর সঙ্গে কুরআন সহমত পোষণ করেছে। বিষয়টি হলোঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সহধর্মিণীগণের পর্দা। তিনি রাসুলকে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি যদি আপনার স্ত্রীগণের পর্দার ব্যবস্থা না করেন, তাদের ব্যাপারে নানা ধরনের কথা বলা হবে। আপনি তাদের পর্দার ব্যবস্থা করুন। এরপরই নাযিল হলো-

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ

‘তোমরা যখন তাঁর পত্নীদের কাছে কোনো জিনিস চাইবে, পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্যে অধিকতত পবিত্র। তোমাদের কারো জন্যে রাসুলকে কষ্ট দেয়া সঙ্গত নয়’। [সুরা আহযাবঃ আয়াত৫৩]

উমর রাঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরো বলেছিলেন, আপনি যদি মাকামে ইবরাহিমকে[২৯] নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ করতেন! তখন এই আয়াত নাযিল হয়-وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ‘তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো’।]সুরা বাকারাঃআয়াত ১২৫]

বদর যুদ্ধের বন্দিদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও উমর রাঃ-এর মতের সঙ্গে আল্লাহর বাণী সহমত ঘোষণা করেছিলো। উমর রাঃ যখন সব বন্দিকে হত্যা করার অভিমত প্রকাশ করেন, বোঝা যায়, তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস। মুহাদ্দিস হলেন যাঁদের কাছে সত্যের ইলহাম (অন্তরে অনুপ্রেরণা) আসে বা যাঁদের জিহবা থেকে সত্যবাণী নিসৃত হয়। আমার উম্মতের মধ্যে যদি মুহাদ্দিস থেকে থাকেন, তাঁদের একজন হলেন উমর বিন খাত্তাব রাঃ। আল্লাহপাক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনিও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছেন।

কুরাইশ তাদের লজ্জা ও লাঞ্ছনা বহন করে মক্কায় ফিরেছিলো। তাদের পৌরুষ ঢেকে গিয়েছিলো পরাজয়-ব্যররথতা-গ্লানির আচ্ছাদনে এবং তারা অপমানের চাদর টানতে টানতে পৌঁছেছিলো মক্কায়। কুরাইশদের জন্যে বদর যুদ্ধের বিফলতা ছিলো ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। এই যন্ত্রণাদায়ক পরাজয় তারা কখনো আশা করে নি। গোটা আরবে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম কুরাইশকে পরাজিত করেছেন। মুসলমান ও ইসলামের নক্ষত্র আরো উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের বের করে দিলেন

বদর যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিজয়ের পর মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই নতুন ধূর্তামির আশ্রয় নেয়। সে তার সঙ্গীদের বলে, 'এই বিষয়টি [মুসলমানদের বিজয়] এখন থেকে ঘটতেই থাকবে। সুতরাং আমরা মুসলমানদের সঙ্গে থাকবো'। সে ও তার সঙ্গীরা মুসলমানদের সঙ্গে থাকে।

এদিকে ইহুদিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিজয়ে হিংসা ও ক্রোধে জ্বলতে থাকে। তিনি বনু কায়নুকার ইহুদিদের সমবেত করেন। বদর যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর কী পরিণাম হয়েছে তা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা নিষচয় দেখেছো আল্লাহপাক কুরাইশদের সঙ্গে কী আচরণ করেছেন'। রাসুলের এই কথার জবাবে ইহুদিরা বলে, 'এ-বিষয়টি আপনাকে যেনো ধোঁকায় না ফেলে যে আপনি কুরাইশদের মোকাবিলা করেছেন এবং তাদের সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছেন। আমরা যদি আপনার সঙ্গে লড়াই করি, আপনি ভিন্ন বিষয় দেখতে পাবেন। আপন্র পরিণতি হবে ভিন্ন'।

এরপর একটি ঘটনা ঘটে। একজন মুসলিম নারী কায়নুকার বাজারে কিছু জিনিস বিক্রি করতে আসেন। তিনি জিনিসগুলো বিক্রি করেন। এরপর এক ইহুদি স্বর্ণকারের কাছে যান এবং তার সামনে বসেন। স্বর্ণকার তাঁর চেহারার ঘোমটা খুলে ফেলতে চায়; কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান। স্বর্ণকার শয়তানি চতুরতার আশ্রয় নেয়। সে কৌশলে মহিলার [মাথার] কাপড়ের একটি কোণা তাঁর পিঠের কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে দেয়। মহিলাটি যখন উঠে দাঁড়ান, তাঁর মুখের কাপড় সরে গিয়ে চেহারা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। তিনি জোরে চিৎকার করে উঠেন। একজন মুসলমান ব্যক্তি সেদিকে এগিয়ে যান এবং ইহুদি স্বর্ণকারকে হত্যা করেন। ইহুদিরাও তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পরে এবং হত্যা করে। এই ঘটনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের অবরোধ করেন এবং তাদের সিরিয়ায় [তৎকালীন শাম] বিতাড়িত করেন।

এটাই ছিলো ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম সঙ্ঘাত। বনু কায়নুকাকে হিজরি সালের দ্বিতীয় বছর বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর উচ্ছেদ করা হয়েছিলো। আর বনু নাদিরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো তৃতীয় হিজরিতে অহুদ যুদ্ধের পর। বনু কুরায়যার পুরুষদের হত্যা করা হয়েছিলো হিজরি সালের পঞ্চম বছর। আর খায়বার বিজয় হয়েছিলো হিজরি সালের সপ্তম বছর। উমর বিন খাত্তাব রাঃ-

এর শাসনামলে জাযিরাতুল আরব থেকে ইহুদিদের চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদ করা হয়। উমর রাঃ- বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি-**أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب** 'ইহুদি ও নাসারাদের জাযিরাতুল আরব থেকে বহিষ্কার করো[৩০]'।

২৯) যে-পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহিম আঃ কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন।
৩০) তাফসিরে কুরতুবিঃ ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৭; কানযুল উম্মালঃ হাদিস ১১০১৫

[পর্ব ১৫]

আবু সুফ্‌য়ানের পৌরুষ এবং বর্তমান মুসলিম শাসকদের পৌরুষ

আমরা এবার মক্কায় ফিরে যাই। মক্কাবাসীর জন্যে সে-সময়টা ছিলো ভয়াবহ বেদনা ও কষ্টের। কিন্তু তারা সবার জন্যে কান্না ও শোকপ্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিলো। তাদের কান্না ও শোকপ্রকাশ মুসলমানদের হাস্যরসের বিষয় হতে পারে ভেবেই তারা এসব নিষিদ্ধ করেছিলো। আবু সুফ্‌য়ান কসম খেলেন-বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার পূর্বে তিনি নারী স্পর্শ করবেন না এবং গোসল করবেন না। তাঁরাই ছিলেন পুরুষ! আল্লাহর কসম, তাঁরাই ছিলেন পুরুষ!

১৯৪৮ সালে ইসরাইলের কাছে আরব রাষ্ট্রগুলো পরাজিত হয় এবং তারা ফিলিস্তিনকে বিক্রি করে দেয়। তারা মানুষকে ধোঁকা দেয় এবং কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বলে, মাত্র 'সাত', তারপরই তোমরা সবকিছু ফিরে পাবে। লোকেরা প্রশ্ন তোলে, সাত কী? তারা বলে, সাত দিন বা সাত সপ্তাহ বা সাত বছর। লোকেরা নেতাদের এই আশাবাদের ওপর অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আর আকাঙ্ক্ষা ঝুলিয়ে রাখে। সাতদিন নয়, সাত সপ্তাহ নয়, সাত বছর কেটে যায়, মানুষ তাদের আশার আকাশে কিছুই দেখতে পায় না। বরং এভাবে বিশ বছর কেটে যায়, মানুষের আশার আকাশ শূণ্যই পড়ে থাকে। আরেকবার ইসলামি উম্মাহর মাথার ওপর ভয়ঙ্কর-সর্বনাশা-বুদ্ধিলোপকারী দুর্দশা চেপে বসে।

সা'দ জুমআ ছিলেন জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী[৩১]। তিনি সেই দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে ষড়যন্ত্র ও চূড়ান্ত লড়াই সম্পর্কে একটি বই লেখেনঃ المؤامرة ومعركة المصير/ ষড়যন্ত্র ও শেষ লড়াই। ১৯৬৭ সালে তিনি মুসলিম নেতা ও শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। সা'দ জুমআ বেদুইন ছিলেন এবং প্রতিশ্রুতিপূরণে দৃঢ়চেতা ছিলেন। তিনি তাফিলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাফিলা কয়েকটি বেদুইন গোত্রের একটি অঞ্চল। তাঁর মধ্যে কিছুটা পৌরুষ ও কল্যাণ অবশিষ্ট ছিলো। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে আরব নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। তিনি বিশ্বাসঘাতকতার যে-ভয়ঙ্কর রূপ দেখার তা দেখেছিলেন। একারণেই তিনি তাঁর ১৯৬৭ সালের কৃতকর্ম ও পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন। সে-সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীরা তাঁকে কেবল দুর্দশাই উপহার দিয়েছিলেন। সা'দ জুমআ সম্ভবত দুইমাসকাল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই দুইমাসেই তিনি যে-বিপদ ও সর্বনাশ দেখেছিলেন তা ছিলো তাঁর চিন্তা এমনকি কল্পনারও বাইরে। তিনি আরব রাষ্ট্রগুলোকে ভর্তসনা করে বই লিখতে শুরু করেন এবং নিজের পাপক্ষালনের চেষ্টা করেন। আশা করা যায়, মহান আল্লাহ তাঁর কৃত অপরাধ ক্ষমা করেছেন। যিনি তাঁর বইগুলো পাঠ করবেন, সেই সময়ের বাস্তবতা বুঝতে পারবেন। উল্লিখিত বইটি ছাড়া তাঁর আরো দুইটি বই হলোঃ الله أو الدمار/ আল্লাহর পথ অথবা ধ্বংস এবং أبناء للأفاعي/ সর্পসন্তান। সর্পসন্তান বইয়ে তিনি আরব শাসকদের চরিত্র- বৈশিষ্ট্য ও সর্বনাশা কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি তাদের 'সাপের সন্তান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই বইটির প্রচ্ছদে একদল সাপের ছবি আছে। এরা হলো সর্পজাতির বড়ো বড়ো নেতা। সর্পসন্তান বইয়ে তিনি লিখেছেন, 'একব্যক্তি আমের আশ-শাবির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলেছি, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যদি জাহান্নামে না যায় তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। এতে কি আমার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে?" আমের আশ-শাবি বলেন, "আরে ব্যাটা, যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে রসরঙ্গ করো গিয়ে। হাজ্জাজ যদি জাহান্নামে না যায় তাহলে আর কেউ জাহান্নামে যাবে না"। আমিও আরব নেতাদের নামে তালাকের কসম খেয়ে বলতে পারি, আরব নেতাদের কেউই সত্যবাদী নন'।

মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকাল আবদুন নাসেরের পৌরুষ সম্পর্কে লিখেছেন। এটা ১৯৬৭ সালের বিপর্যয়ের পরের ঘটনা। তিনি লিখেছেন, 'মিসরের অর্থনীতি নিম্নগামী হতে হতে শূণ্যের কোঠায় পৌঁছার পরও আবদুন নাসের আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে সহায়তা গ্রহণ করেন নি। আরবের নেতারা মিসরকে সহায়তা দানের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু আবদুন নাসের তাঁর আত্মসম্মানবোধ, উচ্চমন্যতা ও আত্মম্ভরিতার কারণে আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে সহায়তা চাইতে অস্বীকৃতি জানান'। সা'দ জুমআ আবদুন নাসেরের অস্বীকৃতির বিষয়টি জানতে পেরে হতবুদ্ধি হয়ে যান। তিনি বয়রুতের সংবাদপত্রে এই বিষয়টির সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে, হ্যাঁ, আবদুন নাসের কোনো প্রকারের সহায়তা প্রার্থনা করেন নি। তবে তিনি বাদশাহ

ফয়সালের পদচুম্বন করার জন্যে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছিলেন। আবদুন নাসের বলেছিলেন, "এই জাতি জীবন্মৃত হয়ে থাকবে; কিন্তু কারো কাছে হাত পাতবে না'"। এ-কথা কে বলেছিলেন? আবদুন নাসের। অবশ্য আমি এই ঘটনাটি মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকালের এ-বিষয়ে লেখার আগেই একজন মুসলিম সাংবাদিক থেকে জানতে পেরেছিলাম। তিনি আমাদের বাসায় এসেছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি বোধগম্য যে আবদুন নাসের তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মগরিমা ও উচ্চমন্যতার কারণে সহায়তা চান নি। তিনি আমাকে বললেন, শুনুন শায়খ আবদুল্লাহ, আরবের এই নেতারা এমন সব কর্মকাণ্ড করেছেন, আপনার এই ছোটো ছোটো ছেলেরাও সেগুলো করতে লজ্জাবোধ করবে।

সা'দ জুমআ বলেন, 'আরবের নেতারা সমবেত হলেন। আমিও সেখানে উপস্থিত হলাম। আবদুন নাসের আমাদের কাছে কিছুই চান নি। তবে তিনি বাদশাহ ফয়সালের পদচুম্বন করার জন্যে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই জাতি জীবন্মৃত হয়ে থাকবে; কিন্তু কারো কাছে হাত পাতবে না"। তখন ইয়ামানের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মিসর থেকে বাদশাহ ফয়সালের কুৎসা রটনা করতে অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। আবদুন নাসের নিজে এই অনুষ্ঠান নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'আল্লাহর শত্রু'। প্রতিদিন 'আল্লাহর শত্রু' নামের অনুষ্ঠানে সৌদি আরব ও বাদশাহ ফয়সালের নামে কুৎসা প্রচার করা হতো। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এর পরেও বাদশাহ ফয়সাল মিসরকে দশ মিলিয়ন পাউন্ড সহায়তা দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অর্থ মিসরের রাষ্ট্রের কোনো কাজে লাগে নি। কারণ তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় নি; মূলধন হয়ে আবদুন নাসেরের ব্যক্তিগত হিসাবে জমা হয়েছিলো'।

একারণেই আবদুন নাসেরের মৃত্যুর পর এক বিচারপতি এ-বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাষ্ট্রের বেসরকারি প্রতিবেদনে দেড়মিলিয়ন পাউন্ডের কোনো হিসাব পাওয়া যায় নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দশ মিলিয়ন পাউন্ডই দেড়মিলিয়ন পাউন্ডে রূপান্তর হয়ে আবদুন নাসেরের ব্যক্তিগত হিসাবে জমা হয়েছিলো।

আমি আপনাদের কাছে কাফের আবু সুফ্য়ান ও মুসলিম শাসকদের মধ্যে পার্থক্য যে কী তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে এসব ঘটনা টেনে এনেছি। সা'দ জুমআ বলেন, 'আমরা তিনদিন খারতুমে বসে থাকলাম; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। এটা ছিলো ১৯৬৭ সালে পরাজয়ের অব্যবহিত পরের সম্মেলন। এই সম্মেলনে আরব নেতারা মুখোমুখি উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি নি এবং কোনো কাজও করতে পারি নি। সম্মেলন শেষ হলে আমরা নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইলাম। কিন্তু সাংবাদিক পাহাড় ও সমতল ভূমিতে পরিপূর্ণ ছিলো। তাঁরা আমাদেরকে যে- হোটেলে ছিলাম সেখানে ছেকে ধরলেন। আমরা বলাবলি

করতে লাগলাম, সাংবাদিকদের আমরা কী বলবো? একজন এই প্রশ্নের সমাধানে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আপনারা বলবেন যে আমরা তিনটি বিষয়ে একমত হয়েছি। -আল্লাহপাক সত্যই বলেছেন, শয়তান তাদের কর্মকান্ডকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়[৩২]। -বিষয় তিনটি কী? আসলে কিছুই না। কারণ কোনো বিষয়েই তাঁরা একমত হতে পারেন নি। না সন্ধিচুক্তি, না সমর্পণ, না পারস্পরিক বৈঠক-কোনোটিতেই না। তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেন নি'।

এটা '৬৭ সালের পরাজয়ের তিনদিন পরের ঘটনা।

আমরা আবু সুফ্য়ানের কথা আলোচনা করছিলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার আগ পর্যন্ত তিনি নারী স্পর্শ করবেন না। কার্যত তিনি তাই করেছিলেন। রমযান মাসে বদর যুদ্ধ হয়েছিলো। তারপর শাওয়াল মাস গিয়ে যিলকদ মাসও গেলো। তারপর যিলহজ মাস এলো। আবু সুফ্য়ান এ-সময় একবার মদিনার দিকে গেলেন। রাতের বেলা হাইয়া বিন আখতাবের বাড়িতে গিয়ে দরজায় টোকা দিলেন। কিন্তু সে দরজা খুলতে অপারগতা জানালো। এরপর তিনি সালাম বিন মুশকামের বাড়িতে গেলেন। সালাম বিন মুশকাম ইহুদিদের নেতা এবং তাদের কোষাগারের খাজাঞ্চি ছিলো। সে আবু সুফ্য়ানের জন্যে ঘরের দরজা খুলে দিলো। তাঁকে আপ্যায়ন করলো এবং মদিনার খবরাখবর দিলো। পরের দিন আরিদ এলাকায় আবু সুফ্য়ানের দল হঠাৎ অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদের কয়েকটি খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেয়। দুজন মানুষকে সেখানে পেয়ে হত্যা করে। আগুন-প্রজ্জ্বলন ও হত্যাকাণ্ডের পর আবু সুফ্য়ান পালিয়ে যান। এই সংবাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে। তিনি কারকারাতুল কদর এলাকা পর্যন্ত এগিয়ে যান। কিন্তু বুঝতে পারেন যে আবু সুফ্য়ান তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে। আবু সুফ্য়ান অনেকটা পরিমাণ সাওয়িক বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। (সাওয়িকঃ মধু, খেজুর, ঘি, যব ও আটার সংমিশ্রণে তৈরি মণ্ড। আটার সঙ্গে মধু ও ঘি মিশিয়ে তৈরি করা হয়। বলা যায়, আমরা যে কেক খাই প্রায় তার মতো।) এই অভিযানকে তাই 'যাতুস সাওয়িক' অভিযান বলা হয়। কিন্তু আবু সুফ্য়ানের কাছে তাদের এই হামলা প্রতিশোধ বলে বিবেচিত হয় নি। তাঁর সঙ্গে যে-কাফেলা ছিলো তারা বেঁচে গিয়েছিলো। আবু সুফ্য়ান মক্কায় পৌঁছলে সাফওয়ান বিন উমাইয়া, আবদুল্লাহ বিন আবু রবিয়া ও ইকরামা বিন আবু জাহ্ল তাঁর কাছে সমবেত হলো। তারা আবু সুফ্য়ানকে বললো, 'এই কাফেলায় যতো ব্যবসায়ী আছে সবার সম্পদ একত্র করে আপনার হাতে তুলে দেবো। এই কাফেলা সবসময় আপনার অধীন থাকবে- যাতে মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেন'। সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! তারা ছিলো মানুষ এবং তাদের ভেতর পৌরুষ ছিলো। তাদের লজ্জা ও আত্মগরিমা

ছিলো। পরাজয়ের গ্লানি তাদের ওপর ভারী বোঝা হয়ে চেপে বসেছিলো। এই গ্লানি ধুয়ে ফেলার আগ পর্যন্ত তারা ঘুমাতে পারে নি। তাদের যাবতীয় সম্পদ তারা যুদ্ধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সোপর্দ করেছিলো।

যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার জন্যে আমাদেরও কাজ করতে হবে। মিসরীয় গায়িকা উম্মে কুলসুম[৩৩] ফ্রান্সে যান, ইউরোপে যান। গানের অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন এবং যুদ্ধব্যয় মেটানোর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেন। উম্মে কুলসুমের গানের আসর বেশ ভালো জমে এবং তিনি সারারাত গান গেয়ে যুদ্ধে ব্যয় করার জন্যে অর্থ তোলেন। ...না কোনো সমস্যা নেই... এতে কোনো সমস্যা হয় না। হাশিশের [এক প্রকার মাদকদ্রব্য] ধোঁয়ায় কায়রোর রাতের আকাশ ছেয়ে যায়... তাতেও সমস্যা নেই। মিসরীয়রা সারামাস ধরে টাকা-পয়সা জমা করে। ঠেলাগাড়ি ও টানাগাড়িতে তারা সবজি, টমেটো, গোল আলু ও অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে। এক পিয়াস্টারের [,মধ্যপ্রাচ্যে প্রচিলত মুদ্রার একক] জিনিস বিক্রি করলেও তারা মিথ্যা বলে। দুই পিয়াস্টারের জিনিস বিক্রি করলেও তারা মিথ্যা বলে। ধোঁকা না দিয়ে তারা কাউকে ছাড়ে না। এভাবে একমাসে হয়তো তারা পাঁচটা [মিসরীয়] পাউন্ড জমা করে। এই পাঁচ পাউন্ড নিয়ে মাস শেষে তারা সঙ্গীত-তারকা উম্মে কুলসুমের কনসার্টে যায়। উম্মে কুলসুম অন্তহীন অনিষ্টতার নক্ষত্র। যদিও তারা তাঁর নাম দিয়েছে 'মধ্যপ্রাচ্যের নক্ষত্র'।

আমার ভাইয়েরা, আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন। '৬৭ সালের পরাজয়ের পর পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো আরব রাষ্ট্রগুলোকে আটা, গম ও অন্যান্য সামগ্রী দান করেছে। আক্রান্ত তিনটি রাষ্ট্রের একটির বন্দরে পশ্চিমাদের সাহায্য-করা গমের চালান এসে ভেড়ে। এ-সময় বিচারপতি গোত্রের এক নারী-যিনি কোনো হোমরাচোমরা নেতার স্ত্রী-গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্যে ইউরোপে যেতে চান। কারণ, আম্মানে প্রচণ্ড গরম। তিনি আম্মান থেকে ইউরোপে উড়ে যেতে চান, কারণ, আম্মানে গরম! তাঁর তিরিশ হাজার দিনার দরকার। তিনি সরকারের কাছে টাকা চান। অর্থমন্ত্রী তাঁকে জানান, আমাদের কাছে টাকা-পয়সা নেই। অর্থমন্ত্রীকে বলা হয়, বন্দরে গমের চালান পড়ে আছে। গম বিক্রি করুন এবং তাঁকে টাকা দিন। তাঁর ইউরোপে ভ্রমণ ও সেখানে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা করুন।

হ্যাঁ, আবু সুফ্য়ান, ইকরামা, সাফ্ওয়ান পরবর্তী যুদ্ধে বিজয় বা বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সম্পদ জমা করছিলেন।

তাঁরা কোথায় আর আমরা... আমরা কোথায়? আল্লাহপাক আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

সা'দ জুমআ সেই সময়ের দুর্দশার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পেট্রোডলারের অধিকারী এক নেতা আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমরা তাঁর জন্যে মরুভূমিতে বালুর ওপর একটা শামিয়ানা টানিয়ে দিলাম। আমরা ভেবেছিলাম এটা তাঁর জন্যে বিশেষ উপযোগী হবে। তাঁকে অভিনন্দন জানানো, সংবর্ধনা দেয়া এবং যাবতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আমরা করেছিলাম। মরুভূমির শামিয়ানাতেই আলোচনায় বসবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা শামিয়ানাতেই বসেছিলাম। হঠাৎ সেই আমিরের অনুপস্থিতি টের পেলাম। শামিয়ানার ভেতর তাঁকে পাওয়া গেলো না। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেলো'। সা'দ জুমআ বলেছেন, 'আমরা তাঁকে শামিয়ানার বাইরে একটা বালুর ঢিবির ওপর শুয়ে থাকতে দেখলাম। একজন লোক তাঁর সমস্ত শরীর দলাই মলাই করে দিচ্ছে। আমরা তাঁকে বললাম, আমাদের সম্মানিত নেতা, সম্মানিত আমির, আপনি এখানে কেনো! চারদিকে নিরাপত্তাবেষ্টনী, মন্ত্রীরা আপনার অপেক্ষায়... সমস্ত লোক আপনার অপেক্ষায়... এবং... এবং... আরো নানা কথা তাঁকে বলা হলো'। আমির বললেন, "আল্লাহর কসম, এখানে তো আমার জন্যে 'আবু যায়দের ঘটনা' শুরু হয়েছে। আমি চেয়েছি, এখানেই সে তার ঘটনার সমাপ্তি ঘটাক"'। এই হলেন সা'দ জুমআ। তিনি সত্য কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন 'তিনদিন এভাবে ঘোরাঘুরি করার পর আমরা আলোচনা শুরু করলাম। আমরা তাঁকে বললাম, "ইসরাইলের মোকাবিলা করতে হলে জরুরিভাবে আমাদের অর্থ দরকার। আমাদের সমরাস্ত্র কিনতে হবে"। আমির বললেন, "অস্ত্র? অস্ত্রের কী দরকার? আপোসই সর্বোত্তম বিধান। আমার বিশ্বাস, আপোসই সর্বোত্তম বিধান"। এসব কথা বলে আমির চলে গেলেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারলাম না।

সা'দ জুমআ লিখেছেন, 'কিছুদিন পর এই আমির সম্পর্কে জেনেভা থেকে আমাদের কাছে সংবাদ এলোঃ জেনেভায় গিয়ে এক সকালে তিনি বিরক্তিতে ঠোঁট বন্ধ করে বসেছিলেন। তাঁর খেদমতগারেরা বললেন, " আমাদের সম্মানিত আমির, কী অবস্থা আপনার?" আমির বললেন, "আমার একজন উষ্ট্রী দোহনকারী প্রয়োজন"। খেদমতগারেরা বললেন, "এটা খুবই সহজ বিষয়"। তাঁরা তাঁদের দেশে ফোন করলেন। কিন্তু তাঁরা সামান্য ভুল করলেন। "আমাদের কাছে একজন উষ্ট্রী দোহনকারী পাঠিয়ে দাও" বলার বদলে বললেন, "আমাদের কাছে একটি উষ্ট্রী পাঠিয়ে দাও"। দেশের লোকেরা একটি উষ্ট্রী বিমানে ঢোকালো। উষ্ট্রী নিয়ে বিমান উড়ে গেলো। জেনেভায় অবতরণ করলো। বিমান মাটিতে নামার পর যাত্রীদের তল্লাশি করার জন্যে পুলিশ সদস্য এলেন। হঠাত তাঁরা দেখলেন, বিমান থেকে এক "জিন" বেরিয়ে আসছে। তাঁরা -জেনেভা বিমানবন্দরের কর্মচারিরা- জীবনে কখনো উট দেখেন নি। সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তুমুল আওয়াজে

সতর্কতা-সঙ্কেত বাজতে শুরু করলো। এরই মধ্যে এই জিন বিমানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। সতর্কতা-সাইরেন বেজেই চলছিলো। পুলিশ ও কর্মচারী সবাই একত্র হলেন। অবশেষে তাঁরা জিনটাকে পাকড়াও করতে পারলেন এবং আবার বিমানের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। এই বিমানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁরা মারাত্মিক ঝুঁকি নেয়ার অভিযোগ দায়ের করলেন'। এ-ধরনের কুৎসিত বিপদ-আপদ লেগেই ছিলো যা কখনো কখনো হাস্যকর।

تمرست بالأفات حتى تركتها

تقول أمات الموت أم ذعر الذعر

'তুমি বিপদ-আপদেরে চর্চা করে করে অবশেষে তা ছেড়েছো।

তুমি বলে বেড়াও, মৃত্যুর মৃত্যু ঘটেছে এবং আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে আতঙ্ক'।

আল্লাহর কসম, এসব দুঃখ-দুর্দশা অন্তরকে রক্তাক্ত করে, হৃদয়কে বিক্ষত করে এবং আত্মার তন্তুগুলোকে ছিন্ন করে।

৩১) সাদ মুহাম্মদ জুমআ ১৯১৬ সালে দক্ষিণ জর্ডানের তাফিলা এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তিনি কুর্দি। দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৭ সালের ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। এর আগে তিনি আম্মানের মেয়র (১৯৫৪-১৯৫৮), উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৫৮-১৯৫৯), ইরান ও সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত (১৯৫৯-১৯৬২), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত (১৯৬২-১৯৬৫), চিফ অব রয়্যাল হাশেমিয়া কোর্ট (১৯৬৫) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রদূত পদে দায়িত্ব পালন করেন। সাদ জুমআর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলোঃ مجتمع اللكراهية বা ঘৃণার সমাজ।

৩২) সুরা মুহাম্মদঃ আয়াত ২৫

৩৩) উম্মে কুলসুমঃ বিখ্যাত আরব গায়িকা; 'প্রাচ্যের নক্ষত্র' অভিধায় পরিচিত। তাঁর আসল নাম ফাতেমা ইবরাহিম। মিসরের সমুদ্রতীরবর্তী জেলা দাকহালিয়্যা-এর তামাই আয-যাহায়ারা অঞ্চলে তিনি ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন এবং কুরআন শরীফ হিফ্য করেন। চমৎকার কণ্ঠের অধিকারী হওয়ার কারণে সংগীতে অল্প বয়সেই খ্যাতি অর্জন করেন। সমকালীন বিখ্যাত কবি আহমদ শাওকি, হাফিয ইবরাহিম, আযিয আবাযা, আহমদ রামি প্রমুখের লেখা গানে সুরারোপ করেন। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আরব কবি ও পাকিস্তানের জাতীয় কবি মুহাম্মদ ইকবালের গানেও সুর দেন তিনি। গান গাওয়ার পাশাপাশি তিনি কয়েকটি ফিল্মে অভিনয়ও করেন। বিপুল বিত্তের অধিকারী উম্মে কুলসুম সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন এবং মিসরের দরিদ্র জঙ্গোষ্ঠীর জন্যে ব্যাপকভাবে দান করতেন।